ভেতরে

... দুর্নীতি ও মোদীকে নিয়ে উল্লাসকে ২
জুতসই একটা শব্দবন্ধের সন্ধানে ... ৩
জমি অধিগ্রহণ আইন ২০১৩ ... ... ৪
ন্যায় বিচার প্রতিহিংসা হতে পারে না ৫
সরকারি প্রচার বনাম রূঢ় সত্য ৬
আক্রান্ত সংখ্যালঘু এবং শিশুর চিঠি ... ৭

আজকের দেশব্রতী

₹ ২

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১০০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
যান্মাসিক গ্রাহক — ৫০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২০ সংখ্যা ৩৮ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ৩১ অক্টোবর ২০১৩

দার্জিলিং

তেড়ে মেরে ডাণ্ডা, করে দিল ঠাণ্ডা

অসুরদলনী দেবী দুর্গা রাবণ বধের কৈলাশে ফিরেছেন। বাংলার ভৌগলিক বিভাজন চাইতে থাকা দার্জিলিং পাহাড়ের স্বাধীকারকামী আন্দোলনকারীদের কঠোর হাতে দমন করে রাজ্যের মহিমাময়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতাদেবী সদর্পে ফিরেছেন তাঁর সদরদপ্তর নবান্নে। বাংলার আকাশ-বাতাস আজ তাই বিমলাসুরের রাজনীতি বধ পালা গানে মুখর।

'গণতন্ত্র অনেক হল। ওদের (!) এভাবেই শিক্ষা দিতে হয়। আর তা দেখিয়ে দিলেন আমাদের দিদিমণি'—এমনটি শোনা যাচ্ছে সমতলের যত্রতত্র। এমনকি তৃণমূলের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বামফ্রন্টের প্রাক্তন মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা, ক্ষিতি গোস্বামী, মায় বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র সহ তাবত বিরোধীদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। কংগ্রেসেরও মোটামুটি এক রা। চেহারায়, ভাষায়, পোষাকে ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতায় স্বতন্ত্র এই পাহাড়ের মানুষদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আন্দোলনকে পর্যুদস্ত করে আলাদা রাজ্যের দাবিদারদের কোণঠাসা করার রাষ্ট্রনীতিতে শাসক দলগুলোর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অর্থাৎ আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে।

এই অবসরে পাহাড়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাম্প্রতিক অতীত ও ভবিষ্যত সম্ভাবনাগুলো যাচিয়ে দেখার।

২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে পাহাড়ের তিনটি আসন বিপুল সংখ্যাধিক্যে জিতে নিয়ে এবং পরবর্তীতে জি টি এ চুক্তি সম্পাদনের পর বিমল গুরুং-এর দল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা দার্জিলিংয়ে একাধিপত্য কায়েম করে। কিন্তু জি টি এ গঠনের মধ্য দিয়ে পুর্বতন ডি জি এইচ সি থেকে সামান্য অধিক শক্তিশালী স্বায়ত্ব শাসনের কাঠামোকে কাজে লাগিয়ে মোর্চা পাহাড়ী জনতার জীবন-জীবিকার সংকট মোচন বা পরিচিতি সত্ত্বার সংকটের অবসান ঘটাতে ব্যর্থ হয়। বরং পেশী শক্তির আস্ফালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে বিমলের দল গোর্খাল্যাণ্ডের দাবিতে সোচ্চার সি পি আর এম, গোর্খা লীগ বা ষষ্ঠ তফসিলের পক্ষপাতি জি এন এল এফ-এর ওপর দলীয় সন্ত্রাস নামিয়ে তাঁদের বিরোধী কণ্ঠরোধ করতে সচেষ্ট থাকে।

কেন্দ্রের কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকার ভারতের ২৯তম রাজ্য হিসাবে তেলেঙ্গানাকে স্বীকৃতি দিতে উদ্যত হলে মোর্চার ইচ্ছেনিরপেক্ষভাবেই গোর্খাল্যাণ্ডের দাবিটি সামনে আসে জনতার আকাঙ্খার স্বাভাবিক স্ফূর্তিতে। কিছুটা বাধ্য হয়েই মোর্চাকে আলাদা রাজ্যের দাবিদার অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি (জ্যাক) গঠন করতে হয়। বিগত আগস্ট মাসের প্রথম থেকেই পাহাড়ে অনির্দিষ্টকালের বন্ধ ঘোষিত হয় এবং সেপ্টেম্বরে মমতার পাহাড় সফরের সময় জ্যাক-এর পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের আন্দোলন দমনের হুমকির প্রতিস্পর্ধায় 'ঘর ভিতরো জনতা', 'ঘর বাইরো জনতা', মশাল মিছিল এবম্বিধ অভিনব আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষিত হয়। কিন্তু পাহাড়ের গরিব শ্রমজীবী জনতার মাসাধিককালব্যাপী লাগাতার বন্ধ চলতে থাকায় খাবার জোটাতে অসমর্থ, জি টি এ-র মাধ্যমে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির ব্যর্থতা, মোর্চা নেতৃত্বের একগুঁয়েমী ইত্যাদিতে মানুষ ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ে এবং মোর্চার বিরুদ্ধে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের প্রকাশ ঘটে।

এই সুযোগে রাজ্য সরকার প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে পাহাড়ে খাদ্য বিতরণ, কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করে ভীতি প্রদর্শন ও পুরনো মামলার জেরে জি টি এ-র ১১ জন নির্বাচিত পদাধিকারী সহ শহরে-গ্রামে হানা দিয়ে প্রায় ১৫০০ আন্দোলনকারীকে জেলে পোরে। এমনকি মোর্চা ছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বের ওপর মিথ্যা মামলা চাপানো হয়। মোর্চার অন্যতম নেতা বিনয় তামাং-এর গ্রেপ্তারের পরে জ্যাক-কে অগ্রাহ্য করে মোর্চা আবারও এককভাবে বন্ধ ডাকলে তা পাহাড়ী মানুষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। এই প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের কঠোর দমননীতি প্রথাগত রাজনৈতিক মহলে মান্যতা পেতে শুরু করে। এই দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে কার্যকরি গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া দুরে থাকুক, বরং মদন তামাং হত্যাকাণ্ডের অভিযোগপত্রে নাম উল্লেখ থাকাতে মোর্চার সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সন্ত্রস্ত হয়ে সমস্ত রাজনৈতিক উদ্যোগ হারিয়ে ফেলে। ইতিমধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস মোর্চার অপশাসন থেকে পাহাড়কে মুক্ত করার শ্লোগান নিয়ে পাহাড়ের কয়েকটি অঞ্চলে মোর্চা ভেঙ্গে তৃণমূলের সদস্য সংগ্রহে সফল হয়।

এমন অনুকুল পরিস্থিতিতে অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে পাহাড় সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী গোর্খা বিরোধিতায় লেপচা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক ও তৃণমূল দলের প্রথম পাহাড় সম্মেলনের উদ্দেশ্যে দার্জিলিং-এর প্রাণকেন্দ্রে জনসভা ইত্যাদি কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে সেরে ফেলতে পারেন বিনা বাধায়। এমতাবস্থায় মোর্চা নেতৃত্ব রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংঘাতের বিরতি ঘোষণা করে অচিরেই মমতার সঙ্গে বৈঠকের মাধ্যমে জি টি এ-তে ফেরার অঙ্গীকার করে। আলাদা রাজ্যের দাবির প্রতি মোর্চার এ হেন বিশ্বাসঘাতকতায় জ্যাক-এর অন্তর্গত অন্যান্য দলগুলো মোর্চা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে। মোর্চার দলীয় দাদাগিরি, একদেশদর্শিতা, জাতিসত্ত্বার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সঙ্গে প্রকাশ্য বঞ্চনা, দলের অভ্যন্তরে যুব ও নারী মোর্চার অন্তর্লীন বিদ্রোহ যে পাহাড়ে তাঁদের পায়ের নীচে মাটি আলগা করে দিয়েছে—এই তথ্য বিমল গুরুং-দের অজানা নয়। তাই রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমঝোতা করার পরেও দার্জিলিং-এর চক বাজারে তাড়াতাড়াতাড়ি আয়োজিত জনসভায় বিমল গুরুং, রোশন গিরিং-রা বন্ধ থেকে সরে আসার কথা বললেও শান্তিপূর্ণভাবে গোর্খাল্যাণ্ডের দাবিতে

চারের পাতায় দেখুন

ধুবুলিয়া থানায় যুব সংগঠনের বিক্ষোভ ডেপুটেশন

প্রতিবছর দুর্গা পূজা এবং কালীপূজার সময় ধুবুলিয়াতে ব্যাপকহারে বেআইনি জুয়ার বোর্ড গড়ে ওঠে। আর তার সঙ্গে বেআইনি মদের ঠেক। এছাড়াও ধুবুলিয়া থানার অন্তর্গত বাহাদুরপুরে রমরমিয়ে চলছে দেহ ব্যবসা। রাস্তার পাশের ধাবাগুলোতে দিনরাত চলছে এই অবৈধ ব্যবসা। সমস্ত কিছুই চলছে প্রশাসনের পরোক্ষ মদতে। এই সবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এবং চরমহৎপুরের জমিতে সমাজবিরোধী হামলা বন্ধ করার দাবিতে বিপ্লবী যুব অ্যাসোসিয়েশন (আর ওয়াই এ) ধুবুলিয়া থানায় বিক্ষোভ ডেপুটেশন কর্মসূচী গ্রহণ করে। আর ওয়াই এ-র পক্ষ থেকে অন্যান্য গণসংগঠনগুলোর কাছে এই কর্মসূচীতে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানানো হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ২১ অক্টোবর আর ওয়াই এ-র নেতৃত্বে এবং অন্যান্য গণসংগঠনগুলোর সহযোগিতায় প্রায় ২০০ মানুষের উপস্থিতিতে সকাল ১১টার সময় ধুবুলিয়া থানার সামনে বিক্ষোভ সভা হয়, ডেপুটেশন দেওয়া হয়। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সন্তু ভট্টাচার্য, অমিত মণ্ডল, রমেশ দাস, জয়কৃষ্ণ পোদ্দার, বলাই কীর্তনিয়া ও সইদুল মোল্লা। বিড়ি শ্রমিক সংগঠনের বেলা নন্দীর নেতৃত্বে অনেক মহিলা এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন। ডেপুটেশনে দাবি পেশ করা হয়—(১) ধুবুলিয়ার সমস্ত বেআইনি জুয়ার বোর্ড এবং মদের ব্যবসা বন্ধ করতে হবে, (২) বাহাদুরপুরে রমরমিয়ে চলা দেহ ব্যবসা বন্ধ করতে হবে, (৩) ধুবুলিয়া থানাকে নিরপেক্ষ অবস্থান নিতে হবে এবং (৪) চরমহৎপুরের চরের জমিতে গরিব কৃষকদের ওপর সমাজবিরোধীদের হামলা বন্ধ করতে হবে।

হুমাইপুরে ধর্ষণকারীদের শাস্তির দাবিতে মধ্যমগ্রাম থানায় বিক্ষোভ-ডেপুটেশন

বারাসাত শহর এবং সংলগ্ন অঞ্চলে নারী নির্যাতনের ধারাবাহিক ঘটনা সর্বশেষ গণধর্ষণ করে খুন গত ২৬ অক্টোবর মধ্যমগ্রামের হুমাইপুরের মনসাতলায় ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীকে গণধর্ষণ করা হয়। এর থেকে প্রমাণ হয় প্রশাসনের ব্যর্থতার দুষ্কৃতিকারিরা অবাধে গণধর্ষণগুলো সংগঠিত করে চলেছে। ধর্ষণের খবর পেয়ে পরের দিন ২৯ অক্টোবর সি পি আই (এম এল) এবং সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ৭ সদস্যের প্রতিনিধি দল শিবতলা-পাটুলিতে ধর্ষিতা কিশোরীর বাড়িতে যায়, কিন্তু প্রশাসন তার আগেই চিকিৎসার কথা বলে তাকে বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। ফলে সেখানে খোঁজখবর নিয়ে ফিরে মধ্যমগ্রাম থানার সামনে বিক্ষোভ দেখানো ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। দাবি করা হয়—(১) অবিলম্বে সমস্ত দুষ্কৃতিকারিদের গ্রেপ্তার ও দ্রুত বিচার করতে হবে, (২) দুষ্কৃতিদের পেছনে কোন শক্তি কাজ করছে তা প্রকাশ করতে হবে, (৩) ধর্ষিতাকে উপযুক্ত চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে, (৪) এলাকার মানুষের মধ্যে নির্ভয় পরিবেশ ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

এই কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দেন জেলা কমিটির সদস্য নির্মল ঘোষ, সুনিতা এবং অর্চনা ঘটক।

বাঁকুড়ায় ১০০ দিনের কাজে ভাতার দাবিতে আন্দোলন

১০০ দিনের কাজে ভাতা আদায় করার তৎপরতা দেখিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করলেন বাঁকুড়া জেলার হীড়বাঁধ ব্লকের গোপালপুর অঞ্চলের কৃষিমজুররা। লাগোয়া দুটি গ্রামের ৭০ জন কৃষিমজুর ৪ক ফর্মে কাজের আবেদন করার পর তাদের ৪খ ফর্মে কাজ বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু দেখা গেল পরিকল্পনা অনুযায়ী পঞ্চায়েত রাস্তার কাজ শুরুই করতে পারলো না। ফলে কৃষিমজুরদের ফিরিয়ে দেওয়া হল। বর্তমানে গ্রামে কোন কাজ না থাকায় কৃষিমজুররা চরম সংকটে রয়েছেন; স্বভাবতই এ ঘটনায় তাদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বামপন্থী শক্তি প্রভাবিত ঐ কৃষিমজুরদের সাথে সি পি আই (এম এল)-এর স্থানীয় শাখা ও কৃষিমজুর সংগঠন ও আয়লা সংগঠকরা যোগাযোগ করেন।

গত ২২ অক্টোবর পঞ্চায়েত ঘেরাও করা হয়। পঞ্চায়েতের কর্তাব্যক্তিরা 'দেখছি, দেখবো' এ জাতীয় স্তোকবাক্য দিয়ে কৃষিমজুরদের ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কৃষিমজুররা দৃঢ়তার সাথে আইনী দিক তুলে ধরে ভাতার দাবিতে অনড় থাকেন। দীর্ঘ সময় ঘেরাও চলার পর পঞ্চায়েত প্রধান লিখিতভাবে জানাতে বাধ্য হন যে সাত দিনের মধ্যে ঐ ৭০ জনকে একদিনের মজুরি দেওয়া হবে এবং কাজ শুরু করা হবে।

সম্পাদকীয়

বোমাটি ফাটলো

সারদা চিট ফাণ্ড প্রতারণা কারবারের সাথে আর্থিক কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে পড়া নিয়ে কুণাল ঘোষ ও তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের বাদানুবাদের কুনাট্য প্রদর্শন রহস্যাবৃত দুর্নীতির বেশ দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

সারদা মালিক সুদীপ্ত সেন সি আই ডি জিজ্ঞাসাবাদের প্রত্যুত্তরে কুণাল ঘোষের লাখ লাখ টাকা নেওয়ার তথ্য প্রকাশ করে দেয়। তারপর থেকে তাঁকে একদিকে সি আই ডি অন্যদিকে সি ই ডি (সেন্ট্রাল এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট)-র বারবার জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সারদা মালিক প্রতারণার পেছনে আত্মপক্ষ সমর্থনের সাফাই গাইতে দাবি করে তাকে ফাঁসিয়েছে যেমন তার এজেন্টরা বিশাল অঙ্কের টাকা জমা না দিয়ে কমিশন হাতিয়ে নিয়ে, তেমনি ফাঁসিয়েছেন কুণাল ঘোষ-সৃঞ্জয় বোসের দল মিডিয়া ব্যবসায় ফালতু লগ্নী করিয়ে। ধরা পড়ে গিয়ে অভিযুক্ত হয়ে সারদা মালিক যতই 'যত দোষ ...' দেখিয়ে পার পাওয়ার অপচেষ্টা চালাক, তাদের প্রতারণামূলক কারবার ফেঁদে বসার জন্য দরকার ছিল ক্ষমতাসীন রাজশক্তির ছত্রছায়ার, তারা প্রথমে তাই হাত ধরেছিল পূর্বতন 'বাম' শাসকদের, ক্ষমতার পালা পরিবর্তনের সাথে সাথে তারা নতুন শাসকদের সাথে যোগসাজশ করে তোলে। সবই চলছিল তলায় তলায়। কিন্তু প্রতারিত জনতার বিস্ফোরণ শয়তানির সমস্ত সুযোগ উন্মোচিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত তৈরী করে দিয়েছে।

জেরায় সম্মুখীন হওয়ার পর থেকে কুণাল ঘোষের দাবি, তিনি কোনরকম আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িত নন, আজও তিনি একই দাবিতে অনড়। তাঁর পরন্তু প্রথমদিকে বক্তব্য ছিল সারদা মালিকের তদন্তকারি পুলিশ দপ্তরকে দেওয়া চিঠিতে যেখানে বহুসংখ্যকের নাম রয়েছে, তাহলে কেবলমাত্র তাঁকে জেরার পাত্র বানানো হচ্ছে কেন? কুণাল একইসাথে অনেকরকম খেলার তাস খেলতে চেয়েছেন। রাজ্যসভায় তাঁকে সদস্য করা তাঁর দল তৃণমূলও তাঁকে খেলতে সুযোগ দিয়েছে নিজের খেলায় তিনি নিজেই আরও ফেঁসে যাবেন, তৃণমূলের গায়ে দুর্নীতির-তোলাবাজীর নোংরা থাকবে না আশায়। কুণাল কখনও নিজেকে নিষ্কলঙ্কিত প্রমাণ করতে চেয়েছেন, কখনও কেবলমাত্র তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে কেন বলে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন, কখনও তিনি যা জানেন সব ফাঁস করে দেবেন তৃণমূল-নেতৃত্বকে চাপ দিয়েছেন, কখনও দলের সাথে নতুন বোঝাপড়ায় ইঙ্গিত দিতে পুলিশ-প্রশাসনের পরিবর্তে দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের কাছে যা কিছু জানা আছে সব তথ্যই তুলে দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন, তবে শর্তও দিয়েছেন দলকেও রফায় আসার আগাম কথা দিতে হবে। কিন্তু ঘোষ-বোসদের নাম প্রকাশ হয়ে যাওয়ার সময় তাৎক্ষণিকভাবে তৃণমূল নেত্রী স্বয়ং একটা আগল দেওয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন বটে, তবে সেটা করতে গিয়েও দলের আরও অনেক কিছু উদ্‌ঘাটিত হয়ে যেতে পারে আশঙ্কায় তৃণমূল পিছিয়ে আসে। কুণালকে কোণঠাসা করা ও ঘাড় থেকে নামানোকেই তৃণমূল পলিসি-টার্গেট করে। তার জন্য সময় নিচ্ছিল উপলক্ষের। রাস্তা ছাড়াছাড়ি এবং বিপরীতগামীতা শুরু হয় তখন থেকেই। আর মোক্ষম উপলক্ষ এল তৃণমূলে 'থেকেও নেই' সাংসদ সোমেনের এক রক্তদান সভায় কুণালের তৃণমূল নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে আরেকবার বার্তা দিতে গিয়ে বিষোদগার করে ফেলার ঘটনায়। সঙ্গী হয়েছিলেন আরও দুজন অভিনেতা-অভিনেত্রী সাংসদ। কিন্তু তাঁদেরকে শো-কজ করে রেহাই দিলেও রাজ্যসভার সাংসদ কুণালকে শাসকদল বরখাস্ত করে। এরপর থেকে তাঁকে পুলিশী জেরা করা বেড়ে যায়। তবে যে কোনো উদ্দেশ্যেই হোক তাঁকে গ্রেপ্তার করার সবুজ সংকেত দেওয়া হয়নি। ঐ সাংসদকে আরও একবার সম্ভবত সমঝোতার গোপন বোঝাপড়ায় সচেষ্ট হতে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদকের সাথে 'বিজয়া' করতেও যেতে দেখা গেল। কিন্তু বোধহয় সেটা দাঁড়ায়নি। কারণ অনতিবিলম্বেই তাঁকে পুলিশী জেরায় ডেকে পাঠানো হয়। আর সেখান থেকে বেরিয়ে ঘিরে ধরা সাংবাদিকদের মধ্যেই কুণাল বোমাটি ফাটালেন এই বলে যে, সারদার উত্থানের সাথে জড়িয়ে ছিলেন তৃণমূল মনোনীত অন্য রাজ্যসভা সাংসদ সৃঞ্জয় বোস তাঁদের দৈনিক সংবাদপত্র ও মিডিয়া চ্যানেলের সাথে আর্থিক লেনাদেনার স্বার্থে; এছাড়া জড়িত ছিলেন বামফ্রন্ট আমলের এক গোয়েন্দা পুলিশ অফিসার তথা পরবর্তীতে তৃণমূলে যোগ দেওয়া এবং বর্তমানে দলের বীরভূম জেলা পর্যবেক্ষক, যিনি সারদার চিট ফাণ্ড সংস্থার প্রাক্তন মুখ্য নিরাপত্তা অফিসার এবং আমেরিকার লাসভোগাসে সারদার বৈদেশিক বিজ্ঞাপনী প্রচারে কোটি কোটি টাকার জলসার ভারপ্রাপ্ত আয়োজক ছিলেন; আর উঠে এসেছে বিশেষত পরিবহনমন্ত্রী মদন মিত্রের নাম, সারদার দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুরের জমি কারবারের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক প্রতারণার উত্থানের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে মদন মিত্তিরের প্রথমবার বিধায়ক হয়ে ওঠার রাজনৈতিক উত্থানের পর্ব। যারা অভিযুক্ত হচ্ছেন তাঁরা অভিযোগ নস্যাৎ করতে চাইবেন—এটা তাদের শ্রেণী চরিত্রের কারণে অনিবার্য। কিন্তু যে বোমাটি ফেটে গেছে তাকে আর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে এনে নিষ্ক্রীয় করার উপায় নেই। বানজারার চিঠি যেমন মোদীকে জেরবার করছে, কুণালের মুখ খোলাও তৃণমূলের ঘোর অস্বস্তির কারণ। এখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর যদি নৈতিকতার বিন্দুমাত্র প্রমাণ দেওয়ার সততা থাকে তবে অবিলম্বে পরিবহন মন্ত্রীকে পদাপসরণ করে বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিন।

কর্পোরেট মদতপুষ্ট দুর্নীতি ও মোদীকে নিয়ে উল্লাসকে সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করুন

কংগ্রেস যদিও ভোটের বদলে খাদ্য (ফুড ফর ভোট) নিয়ে তার প্রচারকে এক আবেগময় মাত্রা দিতে কঠোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, একই সাথে কিন্তু দুর্নীতির ভূতও তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, ক্ষমতায় টিকে থাকাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে ও আগামী লোকসভা নির্বাচনে এ যাবৎ সবচেয়ে কম আসন পাওয়ার বিপদকে হাজির করেছে। সুপ্রীম কোর্ট যাকে খাঁচায় থাকা তোতা পাখী হিসাবে আখ্যায়িত করেছিল সেই সি বি আই কয়লা কেলেঙ্কারিতে একজন শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি ও একজন অবসরপ্রাপ্ত আমলার বিরুদ্ধে নতুনভাবে একটি এফ আই আর দায়ের করেছে। এ ভি বিড়লা গ্রুপের চেয়ারম্যান কুমারমঙ্গলম বিড়লা ও কয়লা দপ্তরের প্রাক্তন সচিব পি সি পারেখের নাম শুনে অনেকেই ভ্রু কুঁচকেছে, কিন্তু সমগ্র দেশ যা জানতে চায় তা হল ত্রিভুজের আর একটা দিক (বাহু) কেন বাদ থাকল!

কর্পোরেট-আমলা আঁতাত আসলে হল কর্পোরেট-আমলা-মন্ত্রীর আঁতাতেরই এক সংক্ষিপ্ত রূপ আর এই ক্ষেত্রে মন্ত্রী হলেন প্রধানমন্ত্রী ছাড়া আর কেউই নন, যিনি প্রথম ইউ পি এ সরকারের আমলে তিন বছরের জন্য কয়লা মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর জানিয়েছে যে সি বি আই যা উপযুক্ত মনে করবে সে বিষয়ে তদন্ত করার ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা রয়েছে, সাথে সাথে এটাও জানিয়ে দিয়েছে যে কয়লা ব্লক বণ্টনে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে কোন অনিয়ম ঘটেনি। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এটাও বলা হয় যে বণ্টনের ক্ষেত্রে উড়িষ্যা সরকারের জোরালো সুপারিশ ছিল।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর বড় জোর যা করতে পারে তা হল উড়িষ্যা সরকারকে আর একটা পার্টি হিসাবে জড়িত করা, কিন্তু তারা প্রধানমন্ত্রীকে দায়মুক্ত করতে পারে না এবং সি বি আইও যখন অনিয়ম ও যোগসাজশের জন্য ত্রিভুজের দুটি বাহুকে অভিযুক্ত করেছে তখন এফ আই আর-এ প্রধানমন্ত্রীর নাম বাদ পড়ার কোন যুক্তিই থাকতে পারে না। কয়লা কেলেঙ্কারির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর তর্কাতীতভাবেই জড়িত রয়েছে। এখন যদি প্রধানমন্ত্রীকে রক্ষা করতে সি বি আই-কে নির্লজ্জের মত ব্যবহার করা হয় বা বিড়লা ও পারেখের বিরুদ্ধে মামলাকে গুটিয়ে আনা হয়, তাহলেও কিন্তু সরকারকে আগামী নির্বাচনে এর জন্য মূল্য দিতেই হবে।

এটা এক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে, ঠিক এই সময়েই সুপ্রীম কোর্ট সি বি আই-কে রাডিয়া টেপ নিয়ে তদন্ত করতে বলেছে। এটা কেবলমাত্র ২জি কেলেঙ্কারি নয়, কর্পোরেটদের দ্বারা দেশের সম্পদ লুঠ এবং নিজেদের স্বার্থে সরকারি ক্ষমতা ও নীতিকে কাজে লাগানোর বৃহত্তর কাহিনীও সামনে আনবে। আমরা অন্য আর একটা দুর্নীতি, তেল ও গ্যাস দুর্নীতিকে ভুলতে পারি না যা অনেক দিন আগেই প্রচার মাধ্যমের শিরোনামে ও বিচার বিভাগের আওতায় আসা উচিত ছিল। এটা ভারতের বৃহত্তম কর্পোরেট ঘরানার আসল চেহারা ও ভারতীয় রাষ্ট্রের ওপর তার ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে উন্মোচিত করবে। ভারতবর্ষে আজ প্রকৃত ইস্যু নিছকই দুর্নীতি নয়, বরং তা হল যেখান থেকে দুর্নীতি জন্ম নিচ্ছে সেই যথেচ্ছ বেসরকারিকরণ, দেশের সম্পদ যথেচ্ছ লুট এবং কর্পোরেটদের দ্বারা গণতন্ত্রের ধ্বংসসাধন।

দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধি ও সার্বিক অর্থনৈতিক সংকটের জন্য জনগণের মধ্যে জন্ম নেওয়া কংগ্রেস বিরোধিতা থেকে বিজেপি রাজনৈতিক লাভ তুলতে মরিয়া হয়ে উঠেছে, কিন্তু এটাও ঠিক যে বিজেপির কোন বিকল্প নীতিমালাও নেই। প্রকৃতপক্ষে মোদীকে নিয়ে কর্পোরেটদের যে উল্লাস তার ভিত্তি হল এই আকাঙ্খা যে কর্পোরেটদের জন্য অবাধ স্বাধীনতার গুজরাট মডেলকে মোদী অনেক বড় মাত্রাতেই সারা দেশজুড়ে চালু করবে। বিজেপি তাই নির্বাচনে নীতি সংক্রান্ত কোন বিতর্ক চায় না বরং সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ও সন্ত্রাসের আবহে নিজেদের পক্ষে ভোট বাগানোর যে পরীক্ষিত কৌশল সেটাকেই কাজে লাগাতে বিজেপি মরিয়া হয়ে উঠেছে।

যেখানে কংগ্রেসের উপস্থিতি কম এবং অ-কংগ্রেসী অ-বিজেপি মধ্যপন্থী পার্টিগুলোও বেশি বেশি করে তাদের ভাবমূর্তি হারাচ্ছে সেই বিহার ও উত্তরপ্রদেশে এই কৌশলকে কাজে লাগাতে বিজেপি খুবই চেষ্টা চালাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে মোদীর সহকারী অমিত শাহ্-এর দ্বারা সাম্প্রদায়িক আগুনে মুজফফরনগরকে বিধ্বস্ত করার কাজটি সম্পন্ন হওয়ার পরই উত্তরপ্রদেশের রণক্ষেত্রে মোদীর প্রথম আবির্ভাব ঘটে। এখন ২৭ অক্টোবর পাটনায় তার সভা নির্ধারিত হয়ে আছে। কিন্তু বিজেপি/আর এস এস-এর প্রচারযন্ত্র ও কর্পোরেট প্রচার মাধ্যম মোদীকে নিয়ে যতই হৈ চৈ করুক না কেন, সহায়-সম্বলহীন গরিব এক চা বিক্রেতা থেকে রাজনীতিতে বড় আকারে উঠে আসা হিসাবে মোদীকে নতুনভাবে ও সুন্দর মোড়কে যতই হাজির করা হোক না কেন, এ সত্য বুঝে নিতে জনগণের অসুবিধা হয় না যে মোদীকে ঘিরেই কর্পোরেট ঘরানাগুলো সমাবেশিত হচ্ছে।

বিজেপির সাম্প্রদায়িক খেলাকে সাহসের সঙ্গে প্রতিরোধ করার সাথে সাথে বামেদের অবশ্যই ২০১৪ সালের নির্বাচনী প্রচারকে সাম্প্রদায়িকতা বনাম ধর্মনিরপেক্ষতার এক একক ইস্যুতে নামিয়ে আনা চলবে না। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে মর্যাদাহীন ও সুবিধাবাদী শক্তিগুলোর সঙ্গে, যাদের অনেকেই আগে বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ও ক্ষমতার জন্য আবারও মেলাতে পারে, জোট বাঁধার যে কোন প্রচেষ্টাই কোন মর্যাদা বহন করবে না, বরং তা কেবলমাত্র ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকেই তুচ্ছ করে তুলবে। জোট বাঁধার এই প্রচেষ্টা বর্তমান জটিল সন্ধিক্ষণে কর্পোরেটদের দ্বারা জাতীয় সম্পদ লুট আটকাতে, ভারতীয় জনগণের ব্যাপক অংশের স্বার্থে উন্নয়ন কাজের অগ্রাধিকারকে নতুন করে সাজাতে এবং বিশ্বপুঁজি ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতি রণনৈতিক বশ্যতা থেকে মুক্ত করে ভারতের বুনিয়াদী নীতি ও আন্তর্জাতিক ভূমিকাকে স্বাধীন করে তুলতে জনগণের যে শক্তিশালী অভিযান তার রাজনৈতিক অভিঘাতকেও দুর্বল করবে।

কংগ্রেস একদিকে দ্রুত জমি হারাচ্ছে, অন্যদিকে প্রাক্-নির্বাচনী সমস্ত সমীক্ষাতেও দেখা যাচ্ছে এন ডি এ-র প্রাপ্ত আসন ২৭২-এর ম্যাজিক ফিগার তো দূরের কথা, ২০০-তেও পৌঁছাবে না। সমস্ত দিক থেকেই যা বোঝা যাচ্ছে তাতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বিজেপি ও মোদীকে নিয়ে তাদের হৈ চৈ-কে সমঝে দেবে, বুঝিয়ে দেবে যে বাস্তবটা কিছু ভিন্ন। বিপ্লবী কমিউনিস্টদের অবশ্যই বিকাশমান এই পরিস্থিতিকে সবচেয়ে ভালোভাবে কাজে লাগাতে হবে যাতে জনজাগরণ ঘটিয়ে কর্পোরেটদের উল্লাসকে প্রতিহত করা যায়।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ২২ অক্টোবর ২০১৩)

বেহালায় পরিবেশ রক্ষার নাগরিক কনভেনশন

পূর্ব বেহালায় সিরিটি-কালীতলা অঞ্চলে জনগণের জন্য ব্যবহৃত পুকুর ভরাট করার প্রমোটারি চক্রান্তের বিরুদ্ধে সি পি আই (এম এল) ও স্থানীয় নাগরিকদের উদ্যোগে প্রশাসন ও পৌরসভার বিরুদ্ধে কর্মসূচী নেওয়ার ফলে এই অশুভ প্রচেষ্টা রোখা গেছে।

গত ২৭ অক্টোবর সিরিটি-কালীতলা অঞ্চলে কলকাতা নাগরিক সমন্বয়ের উদ্যোগে এক নাগরিক কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। অঞ্চলের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, স্থানীয় ক্লাবের প্রতিনিধিবৃন্দ এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভার সঞ্চালক হিসাবে কলকাতা নাগরিক সমন্বয়ের বেহালা শাখার সম্পাদক শ্রী গোবিন্দ মান্না প্রারম্ভিক ভাষণের পর বক্তব্য রাখেন পরিবেশবিদ অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল ভুপাল লাহিড়ী। তিনি তার বক্তব্যে উন্নয়নের নামে প্রকৃতিকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ও স্থানীয় জেলাশাসককে সংরক্ষণ করার জন্য স্থানীয় মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন।

বক্তব্য রাখেন কলকাতা নাগরিক সমন্বয়ের সম্পাদক শ্রী অমলেন্দু ভূষণ চৌধুরী। তিনি উন্নয়নের নামে কলকাতার নাগরিক সমাজের ওপর নামিয়ে আনা কর্পোরেট পুঁজির হামলা ও প্রমোটার রাজের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বানের পাশাপাশি কলকাতা নাগরিক সমন্বয়ের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন এবং কালীতলা সহ বেহালার বিভিন্ন জলাশয়কে সংরক্ষণ করার জন্য জনগণের উদ্যোগের পাশে কলকাতা নাগরিক সমন্বয় সবসময় থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন, স্থানীয় নাগরিক শ্রী বিমান চক্রবর্তী, কিশোর সংঘের সম্পাদক শ্রী রাম চক্রবর্তী, পুকুরের অংশীদার শ্রী প্রভাত কুমার দাস ও নাগরিক সমন্বয়ের পক্ষে ধীরেশ গোস্বামী। বক্তারা পুকুরকে সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগ ও সহযোগিতার কথা তুলে ধরেন।

এই কনভেনশন থেকে এক নাগরিক সভার মাধ্যমে জলাশয় সংরক্ষণের জন্য একটি মঞ্চ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জুতসই একটা শব্দবন্ধের সন্ধানে

সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদ মনে হয় সকলের নজরে পড়েছে। সি পি এমের পলিটব্যুরো সদস্য তথা রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলের/জোটের নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র অত্যন্ত 'ইন্টারেস্টিং' (মজাদার) এই সংবাদটি ও সাথে সাথে তাঁর রাজনৈতিক উপলব্ধি রাজ্যবাসীর কাছে বিশেষত দলের হতাশ হয়ে পড়া কর্মীদের কাছে পরিবেশন করেছেন (আনন্দবাজার, ২৯ অক্টোবর, ২০১৩)। 'সত্য' পরিবেশনের জন্য শুরুতেই সূর্যবাবুকে ধন্যবাদ। সংবাদটির আনন্দবাজারীয় শিরোনাম ঃ **ছেড়ে যাচ্ছেন যাঁরা, গেলেই ভাল**। শিরোনাম অতিক্রম করে যদি আমরা সূর্যবাবুর উপলব্ধির দিকে এগোই, তা হলে দেখতে পাব, সূর্যবাবু বলছেন, ''**বামপন্থীদের** দিক থেকে যাঁরা **স্বেচ্ছায়** যেতে চান, তাঁদের যাওয়াই **ভাল**'' (বড় হরফ আমাদের)। পাঠক হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন, কারা কোথায় যাচ্ছে, কেনই বা যাচ্ছে, এর সাথে 'বামপন্থারই' বা কি সম্পর্ক আছে? সঙ্গত প্রশ্ন। প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বার করতেই ভাষ্যের চলন। গত ২/৩ দিন আগে সুভাষ বসুর 'আদর্শে অনুপ্রাণিত' দল ফরওয়ার্ড ব্লকের কলকাতা জেলা সম্পাদক মইনুদ্দিন শামস, তাঁর কাউন্সিলার ভাই নিজামুদ্দিন ভাই-ভাতিজা ও বেশ কিছু সুভাষ অনুরাগী সমর্থককে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কিছুদিন আগে হলদিয়া পুরসভার ৪ জন সি পি এম এবং সি পি আই কাউন্সিলার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় পুরসভাটি বামফ্রন্টের হাতছাড়া হয়, ঐ দলত্যাগী কাউন্সিলারদের মধ্যে সি পি এমের ক্ষমতার কেন্দ্র 'এল সি' (লোকাল কমিটি)-র একজন সদস্যও ছিলেন। অতি সম্প্রতি (২৮ অক্টোবর) সাঁইথিয়া পুরসভার একজন সি পি এম এবং একজন ফরওয়ার্ড ব্লক কাউন্সিলার ১০ জন কংগ্রেসী কাউন্সিলারের সঙ্গী হয়ে তৃণমূলে যোগদান করায় সাঁইথিয়া পুরবোর্ড এখন তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। কংগ্রেসে মড়ক লেগেছে, তাই দলে দলে কংগ্রেসী নেতা-নেত্রী-সমর্থকরা দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছে। একই সামাজিক আধার, একই 'মতাদর্শ ও রাজনীতি'-র লোকজন ক্ষমতার এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে যাতায়াত করবে, এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস একই সামাজিক আধার ও রাজনীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা দুটো দক্ষিণপন্থী দল। এই রাজ্যে কংগ্রেস বহু বহু বছর ক্ষমতায় নেই, কবে আসবে, আদৌ আসবে কিনা তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই ঐ সমস্ত লোকজনের দল/জার্সি পরিবর্তনে কোন অসুবিধা নেই। প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা এই নিয়ে ভীষণ 'উদ্বিগ্ন' হয়ে হাইকম্যাণ্ডকে সব জানাতে উঠে-পড়ে লেগেছে। 'হাইকম্যাণ্ড' তা নিয়ে কি করবে আল্লাও জানে না। কোচবিহার, কৃষ্ণনগর, দুবরাজপুর ... একের পর এক এলাকায় কখনও কংগ্রেসী পুরসভা, কখনও পঞ্চায়েত, কখনও ট্রেড ইউনিয়ন বা ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠনের কর্মীরা তৃণমূলে যোগ দিচ্ছে। একটা 'ফ্যাসিস্ট' শক্তি এভাবেই তার শক্তি সঞ্চয় করে। সরকারি ও প্রশাসনিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে, 'জনমোহিনী' শ্লোগান ও কর্মসূচীকে হাতিয়ার করে নিজের পুষ্টি সাধন করে। রাজ্যজুড়ে তীব্র গণআন্দোলন ও শ্রেণী আন্দোলনের অভাবে ফ্যাসিস্ট শক্তি তার গণভিত্তি প্রসারিত করছে। এটা নিশ্চিত চিন্তার ব্যাপার এবং সংগ্রামী বাম গণতান্ত্রিক শক্তিকে এর বিরুদ্ধে জোরালো মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় সূর্যকান্ত মিশ্রের কথায়। সূর্যবাবু বলছেন, ''আগে থেকে জানালে বহিষ্কার করে ওঁদের যাওয়ার পথ আরও **পরিষ্কার** করে দেব। যাতে তাঁরা দলত্যাগ-বিরোধী আইনে না পড়েন'' (ঐ, ২৯ অক্টোবর)। দলের পলিটব্যুরো সদস্য হলে কি হবে, সূর্যবাবু সংসদীয় রাজনীতিতেই গড়ে-পিটে উঠেছেন। লেনিন এক জায়গায় লিখেছেন, এমনকি সংশোধনবাদী/সংসদবাদী দলের সংসদ-সদস্যদের সম্মিলিত সংশোধনবাদ/সংসদবাদ ঐ দলের থেকেও বেশি হয়। সূর্যবাবুরা তার ব্যতিক্রম নয় (সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, সি পি এমের সেই সময়কার কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য, একাই একশো)! সূর্যবাবুর তাই দলত্যাগ-বিরোধী আইনের কথাই প্রথম মনে পড়লো! দলের কর্মীরা, দল-নিয়ন্ত্রিত ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক বা ছাত্র-যুব সংগঠনের কর্মীরা 'আগমার্কা' বামপন্থী দল ছেড়ে একটি দক্ষিণপন্থী দলে, যার ঘোষিত কর্মসূচী 'লাল হঠাও', যোগ দিচ্ছে, তা নিয়ে সূর্যবাবুরা মোটেই চিন্তিত নন। বরং বলছেন, ''**ওদের যাওয়ার পথ আরও পরিষ্কার করে দেব**''। ৩৪ বছর ধরে যারা সরকার বানিয়ে জনগণের '**চেতনা**' উন্নত করলেন (সি পি এমের কর্মসূচীর ১১২ নং ধারা, বা সংশোধিত কর্মসূচী লক্ষ্য করুন), তাঁদের দলের কর্মী, সমর্থক, কাউন্সিলার, পঞ্চায়েত প্রধান ইত্যাদি প্রভৃতিরা কেন দক্ষিণপন্থী দলে যুক্ত হচ্ছেন, তার কোন **আত্মসমীক্ষা** না করে সূর্যবাবুরা তাদের যাওয়ার পথ 'পরিষ্কার করছেন', বলা যায় তাদের চলে যাওয়ায় উৎসাহিত করছেন। সূর্যবাবু এও বলছেন, ওঁরা ''স্বেচ্ছায়'' যাচ্ছেন। কোন তীব্র রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বা রাজনৈতিক সন্ত্রাসে আক্রান্ত কর্মীরা ভয়-ভীতি থেকে, নিরুপায় হয়ে, প্রাণের তাগিদে, দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিস্ট দলে যোগ দিতে বাধ্য হচ্ছেন, এমন কোন কথাও সূর্যবাবু বলেননি। '৭০-এর দশকে বিপ্লবী আন্দোলন যখন গুরুতর ধাক্কা খেল, তীব্র রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও গণহত্যার একের পর এক ঘটনায় রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক হাড়হিম করা অবস্থায় পৌঁছালো, তখন আমাদের আন্দোলনের কিছু দুর্বল চিত্তের কর্মী কংগ্রেসে যোগ দেয়। হ্যাঁ, কংগ্রেসে যোগ দেয়। ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গকে নকশালপন্থীরা কোনদিন ক্ষমা করেনি, বরং তাদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে নেমেছে। এই সমস্ত অধঃপতিত অপরাধীকে **রাষ্ট্র** জেলের ভেতরে, জেলের বাইরে নকশালপন্থী কর্মী ও দরদীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে, এমনকি মহিলা নকশালপন্থী কর্মীদের ধর্ষণের মত ঘৃণ্য কাজে ব্যবহার পর্যন্ত করেছে। ইতিহাস তার সাক্ষী। অথচ সূর্যবাবুদের দল সি পি এম তখন 'কংশাল' 'কংশাল' বলে কি শোরগোলই না তুলেছিলেন। এখনও সুযোগ পেলে বলেন। আর আজ ৩৪ বছরের ক্ষমতায়-জারিত অধঃপতিত কর্মীরা যখন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছে, তখন তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম গড়ে তোলা তো দূরের কথা, সূর্যবাবুরা ওদের 'যাওয়ার পথ পরিষ্কার' করছেন। বুর্জোয়া সংবাদ মাধ্যম সি পি এম/বামফ্রন্ট ছেড়ে আসা এদের 'লাল তৃণমূল', 'নব তৃণমূল' বলে আখ্যাত করছে। তৃণমূলের আদি কর্মীরা 'সবুজ তৃণমূল' হওয়ায় এই নামকরণ। শুনতে বেশ লাগলেও শব্দবন্ধটি ('লাল তৃণমূল') 'পলিটিক্যালী ইনকারেক্ট'। এই সমস্ত অধঃপতিত দলত্যাগীরা কোনদিনই লাল ছিল না, লাল লাল একটি দলের মধ্যে ভিড়ে ছিল। এরাই ঐ দল/ফ্রন্টের '**সম্পদ**' বলে পরিচিত ছিল। আর 'সম্পদ' যেহেতু তাই 'চোখের মণি'ও ছিল। এলাকায় এলাকায় বুথ দখলে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে, জলা জমি ভরাট থেকে ফ্ল্যাট বাড়ি তুলতে, খুন-খারাপি-গণহত্যায় সামনের সারিতে থাকতো। ক্ষমতার মদমত্ততায় সি পি এমের নেতৃবৃন্দ এদের বংশবৃদ্ধি দেখতেই পায়নি। 'শুদ্ধিকরণ' তাই কাগজে-পত্রেই থেকে গেছে। দিল্লীর নেতারা দিস্তা দিস্তা শুদ্ধিকরণের দলিল পাঠাতেন আর আলিমুদ্দিনের কর্তাব্যক্তিরা তা বাগজোলা/চড়িয়াল খালে ফেলে দিতেন।

কয়েকদিন আগে গৌতম দেব মহাশয়ও '৯৮ সাল থেকে 'শুদ্ধিকরণের' কথা বললেন। ১৫ বছর হয়ে গেল (১৯৯৮ থেকে ২০১৩) এখনও 'শুদ্ধিকরণ' সম্পূর্ণ হল না। তার আর দরকার হবে না। কারণ সূর্যবাবু জানাচ্ছেন, এরা ''স্বেচ্ছায়'' যাচ্ছেন। ক্ষমতার এক বৃত্ত থেকে ক্ষমতার অন্য বৃত্তে। '**সংগ্রামের হাতিয়ার' থেকে 'মা-মাটি-মানুষে**'। এই সমস্ত অধঃপতিত এবং দলত্যাগীরা তৃণমূল কংগ্রেসের ঝটিকা বাহিনী বা বাইক বাহিনীর সেনানী। এদের চিহ্নিত করতে হবে, নামকরণ করতে হবে এবং মুখোমুখি প্রতিরোধ করতে হবে। রাজ্যের সংগ্রামী, সচেতন বাম গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐকবদ্ধভাবে এই ফ্যাসিস্ট ঝটিকা বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করতে হবে। সূর্যবাবুদের কাছে বিনম্র অনুরোধ এদের একটা জুতসই নামকরণ করুন। আমরা এই সি পি এম-ত্যাগী তৃণমূলী ব্ল্যাক শার্ট, ব্রাউন শার্টদের এক জুতসই নামকরণের সন্ধানে আছি।

- পার্থ ঘোষ

শোক সংবাদ

গত ২৬ অক্টোবর দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের অন্তর্গত কালারাম হাইস্কুলে সারা ভারত কৃষি মজদুর সমিতির রাজ্য কাউন্সিল বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার সময় পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন কমরেড মেঘনাথ রায়। তাঁকে দ্রুত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সমস্তরকম আধুনিক চিকিৎসার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তিনি প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৫ বছর। তিনি ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি লোকাল কমিটির সদস্য ও গৌড়গ্রাম ১ নং ব্রাঞ্চ কমিটির সম্পাদক এবং সারা ভারত কৃষিমজুর সমিতির রাজ্য কাউন্সিল সদস্য।

কমরেড মেঘনাথের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ আসার পর রাজ্য কাউন্সিল সদস্যরা শোকাহত হয়ে পড়েন। কাউন্সিল বৈঠক থেকে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বৈঠক দুঘন্টা স্থগিত রাখা হয়। বৈঠকে পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য কার্তিক পাল ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অভিজিৎ মজুমদার প্রয়াত কমরেডের পার্টির প্রতি আস্থার বিভিন্ন নিদর্শন তুলে ধরেন।

২৭ অক্টোবর বেলা ৩টার সময় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল হাসপাতালে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার পার্টি নেতা ও কর্মীবৃন্দ মরদেহে মাল্যদান করেন ও প্রয়াত কমরেড মেঘনাথের স্মরণে নীরবতা পালন করা হয়। পলিটব্যুরো সদস্য কার্তিক পাল ও কৃষিমজুর সমিতির রাজ্য সভাপতি সজল পাল উপস্থিত ছিলেন। জলপাইগুড়ি জেলার কার্যালয়ে একই কর্মসূচী পালিত হয়।

সন্ধ্যা ৬টার সময় যখন কমরেড মেঘনাথের মরদেহ তাঁর গ্রামে পৌঁছায় তখন প্রায় তিন শতাধিক মানুষ তার অপেক্ষায় ছিলেন। পার্টি কর্মী ও জনগণের মধ্যে শোকের ছায় নেমে এসেছিল এবং তাঁরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। পার্টির ধমরপুর অঞ্চলের ময়নাগুড়ি ১ নং ও ২ নং লোকাল কমিটির নেতৃবৃন্দ সহ পার্টির সদস্যরা মরদেহে মাল্যদান ও নীরবতা পালন করেন। জমায়েত থেকে ৯ নভেম্বর প্রয়াত কমরেডের স্মরণসভার দিন ঘোষিত হয়।

কমরেড মেঘনাথ ময়নাগুড়ির পার্টির কাজকর্মে নিষ্ঠাবান ছিলেন। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি সাহসী ভূমিকা রাখেন ও এখন অন্যান্য স্থানীয় বামপন্থী শক্তির মধ্যে আন্তঃক্রিয়া চালাতে সচেষ্ট ছিলেন। আজকের উপযোগী পার্টি কাঠামো ও কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলায় তাঁর প্রয়াস উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন পার্টির প্রতি অনুগত এবং সামাজিক ভূমিকায় তন্নিষ্ঠ।

কমরেড মেঘনাথ রেখে গেলেন তাঁর স্ত্রী, একমাত্র পুত্র ও পুত্রবধূ, এক কন্যা এবং অগণিত পার্টির কমরেডদের।

তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। কমরেড মেঘনাথ অমর রহে!

সুব্রত চক্রবর্তী
সম্পাদক
জলপাইগুড়ি জেলা কমিটি

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত
ইংরাজী সাপ্তাহিক
''আপডেট''
গ্রাহক মূল্য ঃ ৫০ টাকা

লক্ষ্ণৌতে উত্তরপ্রদেশ বাঁচাও—গণতন্ত্র বাঁচাও সমাবেশ

উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌতে সি পি আই (এম এল) গত ২১ অক্টোবর এক রাজ্য সমাবেশ করল। এই সমাবেশের মূল উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিপদ যে বাড়ছে এবং তার সামনে অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী দলের সরকার যে নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে—এই দুটো বিষয়কে জোরের সাথে তুলে ধরা। সম্প্রতি মুজফফরনগরে যেরকমভাবে সাম্প্রদায়িক হিংসা চালানো হল আর আইন শৃঙ্খলার করুণ পরিণতি লক্ষ্য করা গেল সেটা অবশ্যই জনগণের জন্য এক গভীর উদ্বেগেরই বিষয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে সি পি আই (এম এল) সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, বিজেপি চেষ্টা চালাচ্ছে উত্তরপ্রদেশকে এক সাম্প্রদায়িক পরীক্ষাগারে রূপান্তরিত করতে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দৌড়ে। অমিত শাহের মতন গুজরাট সরকারের কলঙ্কিত মন্ত্রীদের উত্তরপ্রদেশে নিযুক্ত করা হয়েছে সেখানে গুজরাট ধরণের গণহত্যা ফের সংঘটিত করতে এবং মুজফফরনগরে সম্প্রতি ঘটানো দাঙ্গা হল বিজেপির এই ধরনের শয়তানী পরিকল্পনার একটা নিদর্শন। দীপঙ্কর বলেন, এক্ষেত্রে সমাজবাদী সরকার, যা কীনা দেড় বছর আগে জনবিচ্ছিন্ন বি এস পি সরকার ভোটে ক্ষমতা থেকে উৎখাত হওয়ার পর ক্ষমতাসীন হয়েছিল, এই এস পি সরকার নিজের প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। যে প্রতিশ্রুতির হিসাবই নেওয়া যাক, তা সে অপরাধকে নিয়ন্ত্রণ করা, চাষিদের ঋণ মকুব করা, বেকারভাতা দেওয়া বা সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করা ইত্যাদি যে বিষয়েই হোক, সমাজবাদী দল সরকারের ভূমিকা অতি বাজে। মাফিয়া শক্তিগুলো রাজ্যে দাপট কায়েম করতে চাইছে। তবে সি পি আই (এম এল) সংকল্পবদ্ধ পাল্টা উপযুক্ত জবাব দিতে।

দৃষ্টান্ত তুলে ধরে কমরেড দীপঙ্কর বলেন, পার্টি নেতা রমেশ সোঙ্গরর কথা, যিনি বালি মাফিয়াদের কারবারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন, তার জন্য তার ওপর আক্রমণ হয়েছে, পার্টিকে সেই মূল্য চোকাতে হয়েছে। তিনি বলেন, দেশে এক রাজনৈতিক শূন্যতা চলছে। কেলেঙ্কারীর চূড়ামণি ইউ পি এ সরকারকে দেখে দেখে জনগণ বীতশ্রদ্ধ। ইউ পি এ শাসনে দেশ ব্যাপক কর্মহীনতা, মুদ্রাস্ফীতি ও দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো এক বড় ভূমিকা নিতে পারে, বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের মতন রাজ্যগুলোতে শক্তি সংহত করতে পারে এবং কংগ্রেস, বিজেপি ও তাদের আঞ্চলিক সহযোগী দলগুলোর কর্পোরেটমুখী, সাম্রাজ্যবাদমুখী নীতিগুলোর বিরুদ্ধে দৃঢ় বিরোধীপক্ষের নেতৃত্ব দিতে পারে।

লক্ষ্ণৌ সমাবেশে আরও অনেকে বক্তব্য রাখেন। জে এন ইউ ছাত্র সংসদের সভাপতি আকবর চৌধুরী বলেন, উত্তরপ্রদেশে নিরীহ মুসলিম যুবকদের ধরে ধরে জেলে পোরা হচ্ছে, অনেককে আবার পুলিশের হেফাজতে হত্যাও করা হচ্ছে। তাদের জন্য কোন বিচার নেই। বক্তব্য রাখেন সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য কে ডি যাদব, সুধারক যাদব, কৃষ্ণা অধিকারী,

সাতের পাতায় দেখুন

জমি অধিগ্রহণ আইন ২০১৩ ঃ জমি দখলদারির পুনর্বাসন

সম্প্রতি শেষ হওয়া সংসদের বাদল অধিবেশনে কংগ্রেস আর বিজেপির মধ্যে শুধু বিতণ্ডাই হয়নি, দেখা গেছে উচ্চ পর্যায়ের তর্কাতীত কিছু সমন্বয়ও। এই সমন্বয়ের সূত্র ধরেই সরকার পক্ষ খাদ্য সুরক্ষা, জমি অধিগ্রহণ, পেনসন তহবিলে বিদেশী বিনিয়োগের মত বেশ কিছু বিষয়ে আইন পাশ করিয়ে নিতে পেরেছে। আসুন এখন দেখে নেওয়া যাক জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত পাশ হওয়া নয়া আইনটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক ও তার তাৎপর্যকে।

সেক্সপীয়রের বিখ্যাত ট্র্যাজেডি ''রোমিও ও জুলিয়েট''-এ জুলিয়েট বলেছিল ''নামে কি আসে যায়? গোলাপকে যে নামেই ডাকো না সে সুগন্ধের অধিকারীই থাকবে''। সেক্সপীয়রকে ধার করে কেউ বলতেই পারেন যে নামেই ডাকা হোক বা যে পদ্ধতিতেই নেওয়া হোক, জমি অধিগ্রহণ এর বাস্তবতা একই রকম রূঢ়ই থেকে যাবে। কর্পোরেটদের জন্য জমি অধিগ্রহণের ম্যানেজাররা অবশ্য ভাবেন নামে অনেক কিছুই এসে যায়। আর তাই ১৮৯৪ সালের কুখ্যাত জমি অধিগ্রহণ আইনকে বাতিল করার নামে তারা আবার তাকেই আবার পুনঃস্থিত করেছেন একটা বর্ণাঢ্য লম্বা শিরোনামের আড়ালে; যা অধিগ্রহণের বাস্তবতাকে চেপে দিতে চায় স্বচ্ছতা, ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন ও পুনঃস্থাপন নামের আচ্ছাদনের তলায়।

জয়রাম রমেশ আমাদের জানান ''জমি অধিগ্রহণে যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ এবং স্বচ্ছতা, পুনর্বাসন ও পুনঃস্থাপনের অধিকার'' হল রাহুল গান্ধীর মস্তিষ্ক প্রসূত এবং এই সূত্রে রাহুল উল্লেখ করেছিলেন বুশের জমানায় ৯/১১-র পর আমেরিকায় পাশ হওয়া কুখ্যাত 'পেট্রিয়ট আইন'-এর কথা। আমেরিকান জনগণের মানবাধিকার এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তার ওপর আমেরিকান আগ্রাসনকারীরা যেভাবে 'পেট্রিয়ট' শব্দটির আড়ালে হামলা চালিয়েছিল, রাহুল সেভাবেই অধিগ্রহণ শব্দটিকে ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন, পুনঃস্থাপনের খাপের মধ্যে পুরে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আর বিজেপি সভাপতি রাজনাথ সিং সংসদে এই নতুন নামটিকে প্রশংসা করেছেন, সুষমা স্বরাজ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে প্রশংসা সূচক মুদ্রার ইঙ্গিতে বার্তা পাঠিয়েছেন।

নতুন আইনটি অধিগ্রহণের জন্য বিভিন্ন রকমের শর্তের কথা বলেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষিজমির দ্রুত ও বাধাহীন রূপান্তরের জন্য জায়গা ছেড়ে রেখেছে, আর সেখানে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ বা পুনঃস্থাপনের কোনও জায়গাই রাখা হয়নি। কীভাবে এটা করা হয়েছে এবার সেটা লক্ষ্য করার যাক।

কিছু ব্যতিক্রম সহ আইনটি হল মূলত মোটের ওপর যেখানে আর কোনও পদ্ধতিই কাজ করছে না সেখানে রাষ্ট্রের দ্বারা জমি অধিগ্রহণের জন্য শেষতম কিছু বন্দোবস্ত খুলে রাখার ব্যবস্থা করার একটা ব্যবস্থাপনা। 'ব্যক্তিগতভাবে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে জমি কেনার' ব্যাপারটা এই আইনের বাইরেই রাখা হয়েছে। ২০১১ সালের এই আইনের খসড়ার বিপ্রতীপে এই চূড়ান্ত পাঠটি এই ধরনের 'ব্যক্তিগতভাবে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে জমি কেনার' (পড়ুন যে কোনও ভাবে জমি দখলের) কোনও ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করে দেয়নি এবং এটা পুরোপুরিই সংশ্লিষ্ট সরকারের ইচ্ছা ও মর্জির ওপর ছেড়ে রেখেছে।

রাষ্ট্রের জমি অধিগ্রহণের বিষয়টিকে বৈধতা দেওয়ার জন্য একে বলা হয়েছে 'জনস্বার্থের জন্য' অধিগ্রহণ। নতুন আইনটি বস্তুতপক্ষে কৃষি ছাড়া অন্যান্য যে কোনও কারণেই জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারটিকে 'জনস্বার্থের বিষয়' হিসেবে দেখার বিষয়ে চূড়ান্ত নমনীয়তা বজায় রেখেছে। যে কোনরকম রণকৌশলগত স্বার্থকে আবশ্যিকভাবেই 'জনস্বার্থ' হিসেবে দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে 'নৌ, সেনা, বিমান, বিভিন্ন রকমের সশস্ত্র বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় আধাসেনা সহ ভারত রাষ্ট্রর নিরাপত্তা বা রাষ্ট্রনীতি বা জনগণের নিরাপত্তার জন্য' যে কোনও রকমের জমি অধিগ্রহণ। এরপর আসছে পরিকাঠামোগত বিভিন্ন প্রকল্প, শিল্প করিডর বা খনি সংক্রান্ত বিষয়গুলো এবং বিনিয়োগ এবং উৎপাদনের জন্য জাতীয় উৎপাদন নীতিতে চিহ্নিত বিভিন্ন এলাকার জন্য জমি অধিগ্রহণ। ক্রীড়া, স্বাস্থ্য পরিষেবা, ভ্রমণ ইত্যাদি বিষয়ের জন্য জমি অধিগ্রহণও রয়েছে জনস্বার্থের আওতায়। বেসরকারি হাসপাতাল, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি হোটেলকে এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে, কিন্তু সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের যে কোনও ক্ষেত্র, যেখানে জমির মালিকানা সরকারের হাতে থাকছে, অথবা বেসরকারি যে সমস্ত উদ্যোগ 'জনস্বার্থের' মধ্যে পড়ছে, সবকিছুকেই এই আইনে অধিগ্রহণের আওতায় রাখা হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় বেসরকারি মুনাফা অর্জনের জায়গাগুলোকেও 'জনস্বার্থ' হিসেবে ছাড়া দেওয়া হয়েছে।

১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইনটির বিরুদ্ধে অন্যতম আপত্তির জায়গা ছিল এই আইনে জোর করে যার জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে, তার কথা বলার কোনও জায়গাই প্রায় নেই। সরকার দাবি করছে সে এই বিষয়টি মাথায় রেখেছে এবং এই নতুন আইনটি সরকারি হস্তক্ষেপের আগে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে মোট অধিগ্রহণের ৭০ শতাংশ এবং বেসরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে মোট অধিগ্রহণের ৮০ শতাংশ জমির ক্ষেত্রে পূর্ব সম্মতির প্রয়োজনীয়তার বিধান রেখেছে। কিন্তু রাষ্ট্র যেখানে তার নিজের বা সরকার পোষিত সংস্থার প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণ করছে, সেখানে পূর্ব সম্মতির কোনও জায়গা রাখা হয়নি। বস্তুতপক্ষে শিরোনামের অন্যান্য শব্দগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা থাকলেও 'সম্মতি'র ক্ষেত্রে সেটা রহস্যজনকভাবে অনুপস্থিত।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সম্মতি চাওয়ার পরিবর্তে এই আইন বলেছে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থার সঙ্গে আলাপ আলোচনার কথা, অধিগ্রহণের একটি সামাজিক প্রভাব সংক্রান্ত অনুসন্ধানের কথা, আর তারপর একে এক বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা মূল্যায়নের কথা। অবশ্য বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা এই মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক কোনও ব্যাপার নয়। যে কোনও সরকার তাকে নির্দিষ্ট 'কারণ' দেখিয়ে বাতিলও করতে পারে। কোনও সরকার যদি রণকৌশলগত বিষয়ে কোনও জরুরী অধিগ্রহণ করে, তবে সেখানে সামাজিক বা পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে কোনও অনুসন্ধানের দরকার নেই।

এরপর আসে ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন ও পুনঃস্থাপনের প্রসঙ্গগুলো। এখানেও ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে ব্যক্তিগতভাবে জমি কেনার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না। কোনও বেসরকারি কোম্পানী কেবল তখনই ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন ও পুনঃস্থাপনের প্রসঙ্গগুলোর আওতায় আসবে যখন তার অধিগৃহীত জমির বাইরেও সে সরকারকে তার হয়ে জমি অধিগ্রহণ করতে অনুরোধ করবে। এটা দেখাই গেছে জমি অধিগ্রহণের প্রভাব শুধু যারা জমির মালিক তারা ছাড়াও আরও অনেকের ওপর পড়ে। নতুন আইন এই বিষয়টি স্বীকার করেছে 'প্রভাবাধীন পরিবার' হিসেবে, কিন্তু ভূমিহীনদের ক্ষতিপূরণের বাইরেই রেখেছে। যাদের স্থানচ্যুত হতে হচ্ছে তাদের জন্য পুনর্বাসন ও পুনঃস্থাপনের কিছু ব্যবস্থা রাখা হলেও ভূমিহীন কৃষিমজুর, ভাগচাষী বা জমি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট হরেকরকম কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষজনেরা কিছুই পাবেন না।

জমি অধিগ্রহণের অনেক প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়াও খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও এর পরোক্ষ প্রভাব পড়বে। নতুন আইনে একটি ছোট অংশ আছে, যেটি খাদ্য নিরাপত্তার সুরক্ষার দিকটি তুলেছে, কিন্তু সেখানে সুরক্ষার প্রশ্নে প্রায় কিছুই নেই। টানা লম্বা জমি যেসব কাজের জন্য নিতে হয়, যার মধ্যে আছে রেল লাইন, জাতীয় সড়ক, বড় জেলা সড়ক, সেচের খাল, বিদ্যুৎ পরিবহন ইত্যাদির নির্মাণ, সেসব ক্ষেত্রকে এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখেছি জাতীয় সড়ক ও (পণ্য পরিবহনের) করিডর বানানোর জন্য বিপুল পরিমাণ কৃষিজমির চরিত্র বদল করা হয়েছে। যদিও কৃষিজমির অধিগ্রহণ শুধুমাত্র এই ধরনের টানা লম্বা ধরনের জমির মধ্যেই সীমায়িত নয়। এই আইন সেচসেবিত ও বহুফসলী জমি সমেত সমস্ত ধরনের কৃষিজমিকে জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করতে পারে আর সেটাও কোনও ঊর্ধ্বসীমা না মেনেই। ২০১১ সালের খসড়ায় উল্লিখিত ঊর্ধ্বসীমার বিষয়টিকে এখানে সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

সর্বোপরি এই আইনের ধারায় চতুর্থ সিডিউলভুক্ত জমিকে অধিগ্রহণ করা হবে না বলে এই আইনেরই অন্যত্র উল্লিখিত দাবিকে পুরোপুরি হাস্যকরতায় পর্যবসিত করেছে আইনের ১০৬ (১) নং অংশটি। চতুর্থ সিডিউলে এরকম ১৩টি বিষয় আছে। প্রথমে ২০০৫-এর এস ই জেড আইনে সরকার বিষয়টি ছেঁটে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু ব্যাপক গণপ্রতিরোধের সামনে পড়ে শেষ পর্যন্ত এস ই জেড আইনকে চতুর্থ সিডিউলের বাইরে রাখতে বাধ্য হয়।

কৌতূহলজনক বিষয় হলো এই অংশটি সংযোজনের আগে গ্রামোন্নয়ন দপ্তর একটি খসড়া জাতীয় জমি অধিগ্রহণ নীতি প্রকাশ করেছিল। সেই খসড়া মেনে নিয়েছিল ভারতরাষ্ট্র জমির ঊর্ধ্বসীমার বিষয়টি কিছুতেই স্থির করতে পারছে না আর মনে করেছিল জমির ঊর্ধ্বসীমা সেচসেবিত জমির ক্ষেত্রে ৫ থেকে ১০ একরের মধ্যে এবং অ-সেচসেবিচ এলাকার মধ্যে ১০ থেকে ১৫ একরে নামিয়ে আনা উচিত। খসড়াটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান, এমনকী আবাদী বা জলভিত্তিক খামারের জন্য যে ছাড় আছে তাও বাতিল করার কথা বলেছে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের জমি ব্যবহারকে সর্বোচ্চ ১৫ একরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলেছে। খসড়াতে আরও বলা হয়েছিল মালিকানার পাশাপাশি বাস্তবে ব্যবহৃত জমির ঊর্ধ্বসীমাও ঐ ১৫ একরের মধ্যেই রাখতে হবে, যাতে কোনও ব্যক্তিমালিক বা প্রতিষ্ঠান মালিকানার বাইরেও লিজ নিয়ে তাদের জমির সীমাকে বাড়িয়ে নিতে না পারেন। এই খসড়ার সঙ্গে যদি তুলনা করা যায় এস ই জেড আইন বা নয়া পাশ হওয়া জমি অধিগ্রহণ আইনটির, তাহলেই বোঝা যাবে বড় মাপের জমি অধিগ্রহণের জন্য রাখা ও কৃষিজমিকে অন্য ধরনের জমিতে রূপান্তরের ব্যবস্থাদির বিষয়টি, স্পষ্ট হয়ে যাবে রাষ্ট্রের তঞ্চকতা ও চটকদার দেখনদারির দিকটি।

খাদ্য নিরাপত্তা নিয়েও সরকারের চটকদার দেখনদারি চলছে। সংসদের যে অধিবেশনে জমি অধিগ্রহণ আইন পাশ হয়েছে, সেই একই অধিবেশনে পাশ হয়েছে খাদ্য নিরাপত্তা বিল। পরিমাণ (মাসে মাথাপিছু ৫ কেজি শস্য), গুণমান (কেবল খাদ্যশস্য, কোনও কলাই নয়) এবং ব্যাপ্তি (গ্রামে ৭৫ শতাংশ এবং শহরে ৫০ শতাংশ মানুষের জন্য)-র যে কথা এই বিলে বলা হয়েছে তা যদিও অপর্যাপ্ত, তবুও এই প্রতিশ্রুতিটুকুকেও রক্ষা করতে হলে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ও কর্ষিত জমির পরিমাণ বাড়াতে হবে। এতদসত্ত্বেও রাষ্ট্র ধারাবাহিকভাবে কর্ষিত জমির পরিমাণ কমার পথ খুলে দিচ্ছে। আর তারপর ফসলের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য ভারতীয় কৃষির কর্পোরেটীকরণ ও মারাত্মক জিন পরিবর্তিত বীজ ব্যবহারের নিদান দিচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করার বদলে এটা আরও গভীর কৃষি সংকটের পথই প্রস্তুত করছে।

১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণের ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার সরে যায়নি, বরং এটা প্রথমে ২০০৫ সালের এস ই জেড আইন এবং ২০১৩ সালের জমি অধিগ্রহণ আইনের মধ্য দিয়ে আরও বাড়ানো হয়েছে। যারা দেশকে বাঁচাতে চান এবং দেশের সম্পদকে রক্ষা করতে চান তাদের অবশ্যই এই নিদানগুলোর প্রত্যাখ্যান করতে হবে, সমস্ত উপায়ে ভারতের কৃষিজমি সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য সংগ্রাম করতে হবে।

- দীপঙ্কর ভট্টাচার্য

দার্জিলিং ...

একের পাতার পর

আন্দোলন জারি রাখার কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন। ডিসেম্বরের শেষে দিল্লীতে আলাদা রাজ্যের দাবিতে লাখো লোকের সমাবেশ কর্মসূচী আগাম ঘোষণা করা হয়েছে এই জনসভা থেকে। তবে এই প্রতিশ্রুতি জনগণের কাছে খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য বলে গৃহীত হওয়ার নয় এই মুহূর্তে।

তৃণমূলের পাখীর চোখ এখন দার্জিলিং লোকসভা আসনটির দিকে। এই লক্ষ্য অর্জনের দৌড়ে নিঃসন্দেহে তৃণমূল অনেকটা এগিয়ে। জনমুক্তি মোর্চার নেতৃত্বের তৃণমূল ঘনিষ্ঠ সংখ্যালঘু অংশটি মমতাদেবীর পক্ষে থেকে বাড়তি সুবিধা আদায়ে সচেষ্ট। বিমল, রোশনদের পরবর্তী রাজনৈতিক পদক্ষেপ এই সন্ধিক্ষণে তাঁদের সাংগঠনিক শক্তিকে কতটা সংহত করতে পারবে তা ভবিষ্যৎ বলবে।

অন্যদিকে জি টি এ-র কাঠামোয় মোর্চার প্রত্যাবর্তন ঘটলে তুলনামূলকভাবে ষষ্ঠ তফসিলের শ্রেষ্ঠত্য প্রমাণে ঘিষিং পরিচালিত জি এন এল এফ দলটির পাহাড়ে সক্রিয়তা নজর কেড়েছে। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এই সময়ে বামফ্রন্টের দার্জিলিং জেলার আহ্বায়ক সি পি এম নেতা অশোক ভট্টাচার্যের সুভাষ ঘিষিং-এর সঙ্গে একান্ত বৈঠক নতুন করে ভোটের জোটের পুরনো কৌশলকে খোলসা করতে শুরু করেছে।

ইতিমধ্যে সি পি আর এম দলের পক্ষ থেকে আগামী ৭ নভেম্বর থেকে মোর্চার বিশ্বাসঘাতকতা ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিভেদ রাজনীতির বিরুদ্ধে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। ২৩ নভেম্বর দার্জিলিং শহরে সারা ভারত বাম সমন্বয় (এ আই এল সি)-এর কনভেনশন ও ২৪ নভেম্বর এ আই এল সি-র প্রকাশ্য জনসভায় উপস্থিত থাকবেন সি পি আই (এম এল)-এর সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ।

আলাদা রাজ্যের দাবিটি মমতার কাছে বিমল গুরুং-এর নতি স্বীকারের মধ্য দিয়ে চিরকালের মত অন্তর্হিত হল—এমনটা মনে করলে ভুল হবে। পক্ষান্তরে, লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই কেন্দ্রীয় দাবিটির পুনরুজ্জীবন অচিরেই লক্ষ্য করা যাবে নতুন কোন রাজনৈতিক সমীকরণে।

- অভিজিৎ মজুমদার

''আজকের দেশব্রতী'' সম্পাদকমণ্ডলী

অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল,
অতনু চক্রবর্তী, জয়দীপ মিত্র, অমিত দাশগুপ্ত,
সৌভিক ঘোষাল ও কল্যাণ গোস্বামী

ফিরে দেখা

ন্যায়বিচার প্রতিহিংসা হতে পারে না
বাথানিটোলা গণহত্যা এবং বিহারের রণবীর সেনা

(বিচার বিভাগীয় গণহত্যার পুনরাবৃত্তি ঘটাল পাটনা হাইকোর্ট। সম্প্রতি ১৯৯৭-এর ১ ডিসেম্বর বিহারের জাহানাবাদের লছমনপুর বাথে গণহত্যার রায় বেরিয়েছে এবং নিম্ন আদালতে সাজাপ্রাপ্ত সমস্ত অপরাধীদের বেকসুর খালাস দিয়েছে পাটনা হাইকোর্ট। এর আগেও ২০১২ সালের ১৬ এপ্রিল তাদের রায়ে ১৯৯৬-এর ১১ জুলাইয়ের ভোজপুরের বাথানিটোলা গণহত্যায় নিম্ন আদালতে সাজাপ্রাপ্ত সমস্ত অপরাধীকেই বেকসুর খালাস দিয়েছিল হাইকোর্ট। বাথানিটোলা হত্যাকাণ্ডের রায় নিয়ে ইকনমিক এণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি পত্রিকার ২০১৩-এর ২১ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় বেলা ভাটিয়ার লেখা একটি বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। রায় কতটা প্রহসন ও পক্ষপাতমূলক হতে পারে তার নিদর্শন স্বরূপ ঐ নিবন্ধের অংশবিশেষের বাংলা অনুবাদ আমরা এখানে তুলে ধরছি। —সম্পাদকমণ্ডলী)

... পোড়া বাড়িগুলো থেকে বেরোনো কটু গন্ধ বাতাসকে ভারি করে তুলেছিল, আর সেই বাতাসকে বিদীর্ণ করছিল বুকফাটা বিলাপ আর কান্নার রোল। সন্ধ্যের আবছা আলোয় ভিজে মাটির ওপর মৃতদেহগুলো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিল, যে মাটির ওপর দেখা যাচ্ছিল মরিয়া মানুষগুলোর শত শত পায়ের ছাপ। সেই পরিস্থিতিতেও মানুষজন যখন আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কর্তব্যে নিজেদের সামিল করার চেষ্টা করছিল, তখন অবশেষে পুলিশরা দেখা দিল যারা ঠিক একটা মাঠের ওপারে বারকি খাঁড়াও গ্রামের মিড্‌ল স্কুলেই ছিল। ওরা যখন মৃতদেহগুলোকে রাস্তার ধারে নিয়ে যাওয়ার জন্যে লোকগুলোকে নির্দেশ দিল তখন ওরা তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়ল। মানুষজন ভাবল, সারা বিকেল ধরে ঘটা ঘটনার দিকে যারা চোখ বুজে ছিল তারা নিজেরাই অন্তত মৃতদেহগুলোকে নিয়ে যেতে পারত। চৌকিদারের সহায়তায় পুলিশরা মৃতদেহগুলোকে নিয়ে গেল আর আত্মীয়-পরিজনরা নিয়ে গেল আহতদের। গণহত্যার আগে ও পরে ভোজপুর প্রশাসনের যে শিথিলতা দেখা গেল তা ছিল বিহার প্রশাসনের সার্বিক নিস্পৃহতারই প্রতিফলন। এই ঘটনায় এবং এর আগের অনেক ঘটনাতেই দেখা গেছে, সরকারি প্রশাসন শুধু অযোগ্য ও অকর্মণ্যই নয়, তারা চূড়ান্ত পক্ষপাতদুষ্ট। জেলা প্রশাসন প্রথমে রাস্তার ধারেই খাড়া করা তাঁবুতে ময়না তদন্তগুলো সারতে চেয়েছিল, কিন্তু তাতে কারচুপি হতে পারে বলে সি পি আই (এম এল)-এর কর্মীরা তা হতে দিল না। এরপর মৃতদেহগুলোকে আনা হল আরার সরকারি হাসপাতালে, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী, সেখানে মৃতদেহগুলোকে ফেলে রাখা হয়েছিল জলকাদা ভরা স্থানে খোলা আকাশের নিচে। দেহগুলোকে ঢাকা দেওয়ার কোন চেষ্টা হল না, হত্যার আগে যে মেয়েদের সঙ্গে নির্মম ব্যবহার করা হয়েছিল মৃত্যুর পরেও তাদের চূড়ান্ত অসম্মান করা হল। এক নিহতের আত্মীয় যেমন বলেছিলেন, ''মরার পরেও গরিবদের সম্মান ও মর্যাদা দেখানোর কথা কেউ ভাবতে পারে না''। ময়না তদন্তকারী ডাক্তার তাঁর আরার বাড়ি থেকে আসতে বেশ কয়েক ঘন্টা সময় নিয়েছিলেন। সি পি আই (এম এল) কর্মীরা উত্তেজিত হয়ে হাসপাতালের কয়েকটা চেয়ার ও অন্যান্য আসবাব ভাঙচুর করেছিলেন, যার জন্য জেলা প্রশাসন সাহার ও সন্দেশ বিধানসভা ক্ষেত্রের সি পি আই (এম এল) বিধায়ক রাম নরেশ রাম ও রামেশ্বর প্রসাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছিল।

আহত পাঁচ জনের মধ্যে ছোট বেবি (যার বয়স খুব বেশি হলে ন-মাস তার ঊরু ভেঙ্গে গিয়েছিল) ও শৈলেন্দ্রর (বয়স ১৬ মাস) চিকিৎসা হল আরা হাসপাতালে, রাধিকা, কুসুম ও সাদ্দামকে নিয়ে যাওয়া হল পাটনা হাসপাতালে। পাটনা হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা আরা হাসপাতালের তুলনায় সামান্য ভালো হলেও তা কিন্তু খুব ভালো মানের নয়। ডাক্তার থাকলেও ওষুধ নেই, এরকমই সবকিছু। গণহত্যায় আহতরা সেখানে যাওয়ার পর গোটা ওয়ার্ডের পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হল এবং সি পি আই (এম এল)-এর কর্মীরা চিকিৎসা ব্যবস্থার করুণ দশার দিকে সাংবাদিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন; সিলিং ফ্যান লাগানো হল, সমস্ত রুগীদের বিছানার চাদর দেওয়া হল এবং খাবারের মানেরও উন্নতি ঘটল। আমি যখন তাদের দেখতে গেলাম, রাধিকা ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়েছিল আর থেমে থেমে কথা বলছিল; ওর কাঁধে তখনও একটা গুলি ঢুকে ছিল। সাদ্দামের ঘাড়ে ছিল লম্বা গভীর ক্ষত (১৯৯০-এর উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় জন্ম এবং ইরাকি নেতার নাম অনুসারে ওর নামকরণ), যা ঘাড়টাকে প্রায় আলাদা করে দিয়েছিল এবং ঘাড়ের নিচের ভিতরের অনেকটা অংশই দেখা যাচ্ছিল। ওর ঘাড়ের একটা স্নায়ুর আংশিক ক্ষতি হয়েছিল, যার ফলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো পঙ্গু হয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। হাসাপাতালের বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে ও ছটফট করছিল, ওর বয়সের ছেলের পক্ষে যেটা খুবই স্বাভাবিক। ছটফট করতে করতে ও বলছিল আর একটু স্বস্তিদায়ক জায়গায় ওকে সরিয়ে দিতে, খুঁজছিল মা আর দীনা চাচাকে, যে ছিল চিকিৎসায় তালিম নেওয়া সি পি আই (এম এল)-এর এক কর্মী, সাদ্দামের পরিচর্যা করছিল আর খুব স্বাভাবিকভাবেই সাদ্দামের প্রিয় হয়ে উঠেছিল। কখনও কখনও চাইছিল আর একটু 'হাইতেম' (ওর ভাষায় যেটা হল হরলিকস)। প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে ও ভুল বকছিল আর বিড়বিড় করে বলছিল কারা ওর ওপর চড়াও হয়েছিল----দীপাওয়ালা, বেলওয়া, সুবেরওয়া (ও যাদের নাম বলছিল তারা হল দীপন সিং-এর ছেলে মনোজ সিং (২০ বছর) ও সন্তোষ সিং (২৫ বছর), বেলা সিং (২৫ বছর) ও সুবেদার সিং যে হল অবসরপ্রাপ্ত এক জওয়ান, যার বিরুদ্ধে অপরাধের অনেক ঘটনাই আছে। (২০১০ সালে ফৌজদারি আদালত যখন তাদের শাস্তি দিচ্ছিল, প্রথম তিনজন তখন দাবি করে যে গণহত্যার সময় তারা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল।) কখনও কখনও ওর মুখ দিয়ে অস্ফুটভাবে বেরোচ্ছিল জনপ্রিয় হিন্দি গানের কলি ''দিদি তেরা দেওর দিওয়ানা ...'', যেটা মর্মস্পর্শীভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে ও নিতান্তই শিশু। ওর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল উজ্জ্বল হলুদ ফ্রক বা আর গলায় পুঁতির মালা ঝোলানো ওর বোন সালমা। (জুলাই মাসের শেষ দিকে সাদ্দাম ও বেবিকে বিপদমুক্ত বলা হলেও পরের মাসে দুজনেই মারা যায়।)

একটু উদার মনে বিচার করলেও বাথানিটোলা গণহত্যা মামলায় হাইকোর্টের রায়কে বিবেকহীন ছাড়া অন্যকিছু বলা যায় না। ঐ রায় যা করেছে তা হল, ফৌজদারি আদালতে সাজাপ্রাপ্ত ২৩ জনের বেকসুর খালাসের ভিত্তি তৈরী করা। রায় পুরনো কৌশলেরই আশ্রয় নিয়েছে ঃ সরকারি পক্ষের দুর্বলতা এবং প্রদত্ত সাক্ষ্যের বৈষম্যগুলোর ওপর জোর দেওয়া যাতে তদন্ত ও সংগৃহীত প্রমাণগুলোকে অনির্ভরযোগ্য বলে খারিজ করা যায়। সাক্ষীদের সফলভাবে খারিজ করার পর রায় পুরনো রায়ের নজির টেনে তাদের সিদ্ধান্তের পক্ষে যৌক্তিকতা হাজির করেছে। হাইকোর্টের রায় সুস্পষ্টভাবেই অভিযুক্তদের পক্ষে ঝুঁকেছে। রায়ের শেষের মন্তব্য ঐ পক্ষপাতের একটা দৃষ্টান্ত, যে পক্ষপাতই রায়ের বৈশিষ্ট্য হয়ে দেখা দিয়েছে ঃ

... যারা এই ঘৃণ্য অপরাধ সংঘটিত করেছে তদন্ত তাদের সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি ... তদন্তকে এমনভাবে চালানো হয়েছে যা সত্যনিষ্ঠ ও সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিল না। ... সত্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে চেপে দেওয়া হয়েছে ... যাতে অভিযুক্তদের জড়িত থাকাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, সাক্ষীদের যেভাবে জেরা করা হয়েছে তা একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়। দুর্ভাগ্যবশত, যারা প্রকৃতই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তদন্তে তারা পার পেয়ে গিয়েছে ... (জোর আমাদের, হাইকোর্ট রায়, পৃঃ ৫৬)। দুটি রায়কে খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাচ্ছে, হাইকোর্টের রায় নিম্ন আদালতের রায়ের প্রতি যে পক্ষপাতের কথা বলেছে তার বদলে হাইকোর্টের রায়েই পক্ষপাতের ব্যাপারটা সুস্পষ্ট।

সরকারি পক্ষ ও তদন্ত

যে কোন অপরাধের ক্ষেত্রে সত্যটাকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তদন্তকারী সংস্থার নিরপেক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় বিচার প্রক্রিয়ায় অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রই অবশ্য একচেটিয়া ভূমিকা পালন করে থাকে। যে সমস্ত মামলায় রাষ্ট্র জড়িত থাকে সেখানে এই ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা বারবারই প্রকট হয়ে ওঠে, কেননা মামলাকারীরা রাষ্ট্রের মুখপাত্র না হলেও রাষ্ট্রের দ্বারা তাদের নিয়োগ তাদের কার্যত রাষ্ট্রেরই প্রতিরূপ করে তোলে। বাথানিটোলা মামলায় রাষ্ট্র দুদিক থেকে জড়িয়ে আছে ঃ প্রথমত, গণহত্যার স্থলের ১.৫ কিলোমিটারের মধ্যে তিনটে পুলিশ ফাঁড়ি ছিল যেগুলোতে ৩০ জন পুলিশ ছিল এবং প্রকাশ্য দিবালোকে কয়েক ঘন্টা ধরে হত্যাকাণ্ড চললেও তারা কেউ এগিয়ে আসেনি; রণবীর সেনার সদস্য হিসাবে অভিযুক্তদের পিছনে রণবীর সেনার মতই রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল—সেই সমস্ত শক্তিশালী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা যারা ছিল রাষ্ট্রেরই অংশ বা ঘনিষ্ঠ; কাজেই অপরাধের সংঘটকদের রক্ষা করার মধ্যে একটা স্বার্থ নিহিত ছিল, কেননা তার মধ্যে দিয়ে যারা অপরাধের ''লম্বা হাত''-এর অংশ তাদের রক্ষা করা যেত। এই ধরনের পরিস্থিতিতে একদিকে ঝোঁকা সরকারি পক্ষের দিক থেকে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা একটা চ্যালেঞ্জ। মামলার মূল ঘটনাগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে, তার সবথেকে বড় ত্রুটিটা ছিল মামলার প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে চলার মধ্যে। গণহত্যা ঘটার সময় প্রচার মাধ্যমে তা নিয়ে যেহেতু যথেষ্ট চর্চা হয়েছিল, প্রশাসনকে তাই তাৎক্ষণিকভাবে কিছু ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল ঃ বারকি খাঁড়াও পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারকে (সরকারি পক্ষের এক নং সাক্ষী) সাসপেণ্ড করা হয়েছিল এবং ঘটনার পরপরই অনেক অভিযুক্তকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু তদন্ত শেষ করে চার্জশীট জমা দিতে পুলিশের প্রায় দু-বছর লেগে গেল। ফৌজদারি আদালতে মামলা শুরু হওয়ার পর দীর্ঘ সময় ধরে তা চলল। হাইকোর্টের রায়ে যেমন কিছুটা তির্যকভাবে মন্তব্য করা হয়েছে, ''মামলায় ... ১৩ জন সাক্ষীকে জেরা করতে কার্যত ৯ বছর লেগে গেল। (হাইকোর্টের রায়, পৃষ্ঠা ২২) উল্লেখযোগ্য আর একটা ত্রুটি হল, আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও অপরাধীদের সনাক্ত করার প্যারেডের ব্যবস্থা করা হয়নি; তদন্তকারী অফিসাররা যখন বলেছিলেন যে যারা সনাক্ত করবে তারা তৈরি ছিল না, বাদীপক্ষের সাক্ষীরা বলে যে, সনাক্ত করার জন্য তাদের কখনও ডাকা হয়নি (হাইকোর্টের রায় ঃ পৃষ্ঠা ৯)। অভিযুক্তদের সনাক্ত করার জন্য তাদের অবশেষে ডাকা হয় গণহত্যার এক দশক পর যখন আদালতের মধ্যে সেটি চালানো হয়। এতে অতএব বিস্ময়ের কিছু নেই যে, অনেক অপরাধীকেই সনাক্ত করা যায়নি। সাক্ষীদের দেওয়া বিবৃতি প্রায় এক দশক পরে আদালতে যখন যাচাই হয়, সেগুলোর মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই কিছু গরমিল দেখা দেয় যা তাদের সাক্ষ্যকে দুর্বল করে তোলে। এই ক-বছরে দু-জন সাক্ষী ও দু-জন অভিযুক্তও মারা যায়। কিছু কাঠামোগত ত্রুটি, সরকারি পক্ষের গড়িমসি এবং বিচার প্রক্রিয়ার লাগাতার দীর্ঘসূত্রতা সত্ত্বেও এমন কিছু বিষয় ছিল যেগুলোকে ধরে এগিয়ে যাওয়া যেত। সরকারের পক্ষে কিষুণ চৌধুরীর বিবৃতির ওপর ভিত্তি করে একটি এফ আই আর নথিবদ্ধ করা হয়, যিনি সেদিনের ঘটনায় তাঁর স্ত্রী ও দু মেয়েকে হারিয়েছিলেন। তাতে ১৩ জন সাক্ষীর বিবৃতি ছিল, যেগুলোর মধ্যে ছিল গুলি খেয়েও বেঁচে যাওয়া প্রত্যক্ষদর্শী রাধিকার বিবৃতি, ছিল নিজের মেয়ে ফুলকুমারীর হত্যার সাক্ষী পল্টন রামের বিবৃতি, ছিল লালমুনি গোরাওয়াতের স্ত্রী রামারতি দেবীর বিবৃতি। রাধিকা ও পল্টন রাম দুজনেই তাদের বিবৃতিতে অভিযুক্তদের নাম বলে, জেরার সময় নিজেদের বিবৃতির প্রতি অটল থাকে এবং আদালতে সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার সময় অভিযুক্তদের সনাক্ত করে। আর এক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী নইমুদ্দিনের বিবৃতিকে হাইকোর্ট গ্রহণযোগ্য নয় বলে, কেননা তার দেওয়া বিবৃতিগুলোর মধ্যে নাকি গরমিল ধরা পড়েছিল। সেদিনের গণহত্যায় নইমুদ্দিন তাঁর পরিবারের পাঁচজন সদস্যকে হারিয়ে ছিলেন এবং তাঁর ৬ বছরের ছেলে জীবনের জন্য লড়াই করছিল, কাজেই ঘটনার ঠিক পরপরই বিবৃতি দেওয়ার মত অবস্থা তাঁর ছিল না। পরবর্তীতে তিনি দুবার মুখে ঘটনার বিবরণ দেন এবং একটি লিখিত বিবৃতিও দেন। প্রথম মৌখিক বিবৃতিতে কিছু সংযোজন করা হয় এবং এই কারণেই হাইকোর্টের বিচারপতিদের চোখে তাঁর সাক্ষ্য সন্দেহজনক বলে বিবেচিত হয়। নিম্ন আদালত তাঁর সাক্ষ্যকে গ্রাহ্য বললেও হাইকোর্টের রায় বলে যে তা নির্ভরযোগ্য নয়।

বিবাদী পক্ষের যুক্তি

বিবাদীপক্ষের যুক্তি দাঁড়িয়ে আছে তিনভাবে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করার দাবির ওপর ঃ প্রথমত, গণহত্যার দিন বিকেলের শেষ দিকে বারকি খাঁড়াও পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ কর্মীরা লিখিতভাবে সাহার থানায় ঘটনাটি জানায়, যার ভিত্তিতে জেলার সংশ্লিষ্ট অফিসারদের কাছে তারবার্তা পাঠানো হয় এবং তাদের অনেকেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং পরবর্তী কয়েক ঘন্টায় আটজন মানুষের বিবৃতি গ্রহণ করা হয়—এগুলো ঘটলেও ফর্দবয়ান (ব্যক্তিবিশেষ যে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়) হিসেবে সেগুলোকে গ্রহণ করা হয়নি; যে ফর্দবয়ান-এর ভিত্তিতে এফ আই আর দাখিল হয় তা নথিবদ্ধ করা হয় ১২ ঘন্টা পর পরদিন সকালে, যাতে ''পরিকল্পিতভাবে অভিযোগ করা হয়''। ফলে এফ আই আর-এর ''বিশ্বাসযোগ্যতা, সঠিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা'' চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়ায় (হাইকোর্টের রায়, পৃষ্ঠা ৯-১০)। দ্বিতীয়ত, ঘটনার পরপরই গ্রাম ও অন্যান্য একটি স্থান থেকে অভিযুক্তদের ''অনায়াসে ধরা দেওয়া অপরাধী''র মত গ্রেপ্তার করা হয়। তৃতীয়ত, পুলিশী হেফাজতে নেওয়ার জন্য দুদিন দেরি করে তাদের প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে উপস্থাপিত করা হয় এবং আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও অপরাধী সনাক্তকরণের ব্যবস্থা করা হয়নি। এই ত্রুটিগুলোর ভিত্তিতে বিবাদীপক্ষ ''মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা''র কথা বলেছে। তবে, তারা যে অভিমত পোষণ করেছে প্রথম দুটি কারণের জন্য তা সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু তৃতীয় কারণটি থেকে কি করে ঐ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় তা স্পষ্ট নয় ঃ পুলিশ যদি সত্যিসত্যিই ঘটনা জ্ঞাপনকারী ও নিহতদের আত্মীয়দের সঙ্গে যোগসাজশে অভিযুক্তদের মিথ্যাভাবে ফাঁসানোর ব্যাপারে উৎসুক ছিল, তবে তারা কি ব্যাপারটাকে চুকিয়ে দিতে অপরাধী সনাক্তকরণ প্যারেডের পরবর্তী পদক্ষেপটা গ্রহণ করত না?

(পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্য)

ফিরে দেখা

বাথানিটোলা হত্যাকাণ্ড
সরকারি প্রচার বনাম রূঢ় সত্য

(বাথানিটোলা হত্যাকাণ্ডের পর সি পি আই (এম এল)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রচারপত্রের আকারে কমরেড বিনোদ মিশ্রের এই লেখাটি প্রকাশিত হয়।)

আপনারা ভালভাবেই অবগত যে, গত ১১ জুলাই রণবীর সেনার রক্তপিপাসু ঘাতকেরা বাথানিটোলার নিরপরাধ জনগণের উপর পাশবিক হত্যালীলা চালিয়েছে। সেই অভিশপ্ত দিনে ১২ জন মহিলা ও ৮ জন শিশুকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়েছে। এক গর্ভবতী রমণীর পেট চিরে দেওয়া হয়। ছোট্ট একটি শিশুর মাথা তরবারি দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার আগে শিশুটির জিভ কেটে নেওয়া হয়। অপর একটি শিশুর হাত থেকে আঙ্গুলগুলো কেটে নেওয়া হয়। আর একটি নবজাত শিশুকে তার মায়ের বুক থেকে টেনে নিয়ে তরোয়াল দিয়ে দু-টুকরো করে দেওয়া হয় আর তাদের কুঁড়ে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সদ্য কৈশোর পার হওয়া একটি মেয়েকে ধর্ষণ করা হয় এবং তাকে হত্যা করার আগে তার স্তন দুটি কেটে নেওয়া হয়। আহতদের মধ্যে দুটি শিশু বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে অবশেষে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। কেউই একথা অস্বীকার করবেন না যে স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এ ধরনের পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা এক কথায় নজিরবিহীন। এই মর্মান্তিক গণহত্যার আড়ালে যে ঐতিহাসিক পশ্চাদপট তা কি আমাদের প্রত্যেকেরই জানা আবশ্যক নয়? এই বর্বর অপরাধের মধ্যে নিহিত আসল সত্যটিই বা কি?

সরকারি প্রচার—একগুচ্ছ নির্জলা মিথ্যা

আপনাদের জানা দরকার যে দেড় বছর হল রণবীর সেনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার নামে টোলার (বাথানিটোলা—অনুঃ) আশপাশের এলাকায় ৩টি পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে। জেলা প্রশাসনকে এক বড় ধরনের হত্যাকাণ্ডের আশঙ্কার কথা বার বার জানানো হয়েছে। তবুও কোন সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আর রক্তপায়ীদের বীভৎস তাণ্ডবের সামনে পুলিশ থেকেছে নীরব দর্শকের ভূমিকায়। মুখ্যমন্ত্রী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং কর্তব্যে অবহেলার জন্য স্থানীয় পুলিশদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছেন কিন্তু জেলা শাসক বা পুলিশ প্রধানের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিতে তিনি অস্বীকার করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী একদিকে লম্বা-চওড়া ভাষণ দিচ্ছেন অন্যদিকে তিনিই সাংবাদিকদের সঙ্গে ঘরোয়া কথাবার্তার সময় এ হেন উক্তি করেছেন যে ''এম-এল-দের লোকজনেরা যদি অর্থনৈতিক অবরোধ চালাতে থাকে তাহলে তাদের (রণবীর সেনা) কাছ থেকে আর কিই বা আশা করা যায়।''

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টোলা পরিভ্রমণ করেছেন কিন্তু এলাকার জনগণের কাছ থেকে বিস্তারিত জেনে প্রকৃত তথ্য খুঁজে বের করার প্রশ্নে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই বলেই মনে হয়েছে। তিনি আমাদের পাটনার প্রতিনিধিদের সঙ্গেও সাক্ষাত করেননি। উল্টে, মুখ্যমন্ত্রী ও আমলাদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তিনি বিহার পুলিশকে আধুনিকীকরণ ও মজবুত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং দিল্লী ফিরে গেছেন। ভাবখানা যেন এইরকম যে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের অভাবেই পুলিশ এইরকম নিষ্ক্রিয় থেকেছে। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় তিনি যা বলেছেন বলে জানা গেছে তা হল এই যে ভূমিসংস্কার কর্মসূচী রূপায়নে ব্যর্থতার ফলেই এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে (এবং আরো ঘটতেই থাকবে)। মনে হয় এসব কথা বলার সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভুলে গেছেন যে বিহার সরকার জনতা দল ছাড়া আর কেউ চালাচ্ছে না আর তাকে সমর্থন করছে সি পি আই। অবশ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিহার প্রশাসনের নিন্দা করেছেন এবং কোন এক সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী তিনি নাকি প্রশাসনের মদতেই এ ঘটনা ঘটেছে বলে মন্তব্য করেছেন। যাই হোক, লালু যাদবের চাপে শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের কথা প্রত্যাহার করে নেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রকাশ্য অভিযোগের পরেও এবং ডি এম এবং এস পি-কে শাস্তি দেওয়ার জন্য সর্বদলীয় কমিটির সুপারিশ সত্ত্বেও বিহার সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে।

বিপরীতে, এই অপরাধী প্রশাসকেরাই লাঠি, জলকামান ও অন্যান্য সন্ত্রাসমূলক কৌশলের সাহায্যে জনগণের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। তাঁদের দাবিগুলোকে তুলে ধরার জন্য যে সব জনপ্রতিনিধি অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনে বসেছিলেন তাঁদের জেলে বন্দী করা হচ্ছে। আমরা দেখছি আরোয়াল হত্যাকাণ্ড পুনরায় সংগঠিত হচ্ছে আর 'আরায়াল' খ্যাত অপরাধী এস পি কাসোয়ান নির্লজ্জভাবে তাঁর চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসে রয়েছেন। রণবীর সেনার বিরুদ্ধে কোন পুলিশী ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। শাসকশ্রেণীর সব দলগুলোই রণবীর সেনাকে বাঁচাতে সচেষ্ট এবং যতরকমের অবাস্তব যুক্তি আর মিথ্যা প্রচার চালিয়ে তারা আমাদের উপরই দোষারোপ করে চলেছে।

আমাদের তথাকথিত কিছু বাম বন্ধু দায়হীন অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তাঁরা দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক আর সামন্ত-কুলাকদের মধ্যে পার্থক্য করতে অসমর্থ, তাঁরা দলিত ও সংখ্যালঘুরা সাবর্ণ জাতি-আধিপত্যের শক্তিগুলোর মধ্যেকার প্রভেদকেও দেখতে চান না। এই পাশবিক ও ঘৃণ্য ধ্বংসলীলা—যার পিছনে নিহিত রয়েছে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা—তাকে তাঁরা খোলা চোখে সনাক্ত করতে চান না। নবজাত শিশু ও নিরপরাধ মহিলাদের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেখেও তাঁরা পথে নামার কোন গরজ অনুভব করেন না। বরং তাঁরা প্রশাসনের সাথে একই সুরে গলা মিলিয়ে চলেছেন এবং মিথ্যা প্রচার চালিয়ে প্রগতিশীল জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে চলেছেন। এমন এক পরিস্থিতিতে, কঠিন সত্যগুলো সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করা আমাদের কাছে জরুরী, যে সত্যের কথা খবরের কাগজগুলোতে প্রায় অপ্রকাশিতই থেকেছে।

হত্যাকারী রণবীর সেনা ও অশুভ রাজনৈতিক আঁতাত

প্রায় দু-বছর আগে রণবীর সেনা তৈরী হয় যার ঘোষিত লক্ষ্য ছিল ভোজপুরের গরিব কৃষকদের বিপ্লবী আন্দোলনের রোষের সামনে কম্পমান সামন্ততন্ত্রের প্রাসাদকে রক্ষা করা। তারা সর্বশক্তি দিয়ে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল, ''আমরা ভোজপুরকে রাশিয়া কিংবা চীনে পরিণত হতে দেব না; আমাদের বন্দুক দিয়ে আমরা শুধু ভোজপুর থেকে নয়, গোটা দেশ থেকেই লালঝাণ্ডার সমস্ত চিহ্ন মুছে দেব। আমাদের পূর্ব পুরুষদের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাকে আমরা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব ও পুরনো রীতি ও নিয়মবিধিকে পুনরুদ্ধার করব।'' এই সেনা জন্মের পর থেকে, ভোজপুর জেলার কেবলমাত্র সাহার ও সন্দেশ ব্লকেই, প্রায় একশ নিরপরাধ মানুষকে খুন করেছে যার মধ্যে অধিকাংশই হল অত্যন্ত অনগ্রসর দলিত ও মুসলিম সম্প্রদায়ের নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী মানুষেরা। আরা শহরে রণবীর সেনার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে আমাদের পার্টি সদস্যদের ধর্ণা-অবস্থানের ওপর গ্রেনেড ছোঁড়া হয়েছে। ১১ মার্চ দিল্লী সমাবেশে যোগদানের উদ্দেশ্যে আমাদের যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মিছিলকারীরা চলেছিলেন তাঁদের উপরেও একইভাবে গ্রেনেড নিয়ে হামলা চালানো হয়। গ্রেনেডটি ফাটলে শত শত মানুষ মারা যেত। শুরুতে সেনার নেতৃত্ব ছিল কংগ্রেসের সাথে, পরে তারা বিজেপির দিকে ঘুরে যায়, আর এরই সাথে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ই হয়ে ওঠে তাদের আক্রমণের নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু। বিজেপি নেতারা তাদের ঘাঁটিগুলোতে তড়িঘড়ি যাতায়াত শুরু করে দেয় এবং ঘন ঘন সভা করতে থাকে। এরপরই রণবীর সেনা লিখিত 'ফতোয়া' জারি করে বিজেপির প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে দেয়। বিধানসভায় জনতা দল সরকার কর্তৃক এই ফতোয়ার কপিও প্রদর্শন করা হয়। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-সমতা জোটের জোরদার উপস্থিতি জাহির হওয়ার পর সমগ্র বিহার জুড়েই উচুঁজাতের আধিপত্যকারী শক্তিগুলো ও সামন্ত-কুলাক শক্তি নতুন করে বলীয়ান হয়ে ওঠে ও প্রচণ্ড হিংস্র হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্ত শক্তিকে সরাসরি লড়াইয়ে মোকাবিলা করার পরিবর্তে জনতা দলের নপুংসক নেতৃত্ব এদের তোয়াজ করে চলতে থাকে। বিশেষত ভোজপুর জেলায় যেখানে দলিত ও অত্যন্ত অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের অধিকাংশই রয়েছে সি পি আই (এম এল)-এর সাথে এবং যেখানে সি পি আই (এম এল)-এর বৃদ্ধিকে রোধ করার জন্য জনতা দল খোলাখুলিভাবেই সামন্ত জমিদারদের পক্ষ অবলম্বন করে, সেখানে লালু যাদবকে প্রকাশ্যেই অপরাধী জমিদারদের সঙ্গে এক মঞ্চে ভাষণ দিতে দেখা যায়। চন্দ্রদেও ভার্মার মত জনতা দলের সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে রণবীর সেনার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানাতে দেখা যায়। আর দেখা যায় ওই দলের বহু নেতা প্রকাশ্যেই রণবীর সেনার দাগী নেতাদের সঙ্গে পানভোজন করছে। রণবীর সেনার মনোবল বৃদ্ধি এবং তার সাথে প্রশাসনের যোগসাজশের পিছনে এটিই হল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট।

হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে

১৯৭৮-এর গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহম্মদ ইউনুস তদানীন্তন মুখিয়া কেশো সিংকে পরাজিত করে তার আসন দখল নেন। এই ঘটনার পরবর্তী ঘটনাবলীর দিকে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে ইউনুসের বিজয় স্থায়ী সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উচ্চবর্ণের সামন্ত মানসিকতা এই পরাজয়কে মেনে নিতে পারেনি। তারা মুসলিমদের উপর প্রতিশোধ নিতে শুরু করে। তারা প্রথমে ইমামবাড়ার সামনে রাস্তা দখল করে নেয়, তারপরে সরাসরি ইমামবাড়ারই দখল নিয়ে নেয়। '৯১-এর ১৩ আগস্ট আঞ্চলিক প্রশাসকের কাছে এ বিষয়ে এক মামলাও রুজু হয় এবং তিনি তাঁর অধস্তন একজনের কাছে তদন্তেরও ভার দেয়। যদিও রিপোর্টে এই অন্যায় দখল প্রমাণিত হয় প্রশাসন কিন্তু কোন নির্ধারক পদক্ষেপ নেয় না। ১৯৯২-৯৩ নাগাদ, জমিদাররা ইমামবাড়াটি ধ্বংস করে দেয় এবং সমস্ত ধ্বজাগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে জ্বালিয়ে দেয়। স্থানীয় থানায় একটি এফ আই আর নথীভুক্ত করা হয় ও একটি মামলা দায়ের করা হয়। বাথানিটোলা হত্যাকাণ্ডের ১৩ দিন পর, ২৩ জুলাই '৯৬ আদালতে এই মামলার নিষ্পত্তি হয়। রায়ে বলা হয়, সেখানে ইমামবাড়ার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নেই।

একই কায়দায় করবস্থানের জমিও কব্জা করে নেওয়া হয়। ১৯৯৩-এর ১৪ এপ্রিল মহম্মদ নঈমুদ্দিন একটি মামলা দায়ের করেন এবং কবরস্থানের চৌহদ্দি ঘিরে দেওয়ার দাবি জানান। শেষ পর্যন্ত অর্থাভাবে মামলাটি লড়া যায়নি এবং খারিজ হয়ে যায়। কিন্তু অন্যায় দখলদারি আগের মতই বহাল থাকল।

রণবীর সেনার লোকেরা কানফারি (সাহার) ও নওয়াডিতেও (তরারি) কবরস্থান ও কারবালার জমি দখল করে নিয়েছিল। এই জমি দখলদারির প্রতিবাদে ১০ জানুয়ারী '৯৬ কারবালা মুক্তি জন জাগরণ মঞ্চ গঠন করা হয়। কানফারিতে যে সব মানুষ সভা থেকে ফিরে আসছিলেন তাদের উপর ররবীর সেনার লোকেরা হামলা চালায়। কিন্তু তাদের আক্রমণকে প্রতিরোধ করা হয়। উত্তেজনা বাড়তেই থাকে, কিন্তু দখলীকৃত জমি উদ্ধারের জন্য সরকার কোন উদ্যোগ নেয় না। যদিও লালু যাদব ঘোষণা করেন সমস্ত গোরস্থানকে রক্ষা করা হবে, কিন্তু কোন কিছুই করা হয়নি। রমজান মাসে, ২৫ এপ্রিল মহম্মদ সুলতানকে খুন করা হয় কিন্তু তার দেহ রণবীর সেনার দলবল খারাওনের কবরখানায় সমাধি দিতে বাধা দেয়। এখানেও তারা বহু লোককে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল কিন্তু মৃতদেহ নিকটবর্তী ছাতারপুরা গ্রামে সমাধিস্থ করতে নিয়ে গিয়ে এই হত্যাকাণ্ড এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। তাতেও তারা সন্তুষ্ট হয় না এবং তারা খারাওঁ গ্রামের মুসলিম পাড়া আক্রমণ করে এবং মা-লে সমর্থকদের বাড়ীতে হামলা চালায় ও জিনিষপত্র লুটপাট করে। ৫০টি পরিবার গৃহহীন হয়, যার মধ্যে ১৮টি ছিল মুসলিম পরিবার। মহম্মদ নঈমুদ্দিনের পরিবার সহ অনেকেরই পরিবার বাথানিটোলায় আশ্রয় নেয়। কিন্তু যেহেতু মসজিদটি ছিল রণবীর সেনা অধ্যুষিত এলাকায় তাই তারা ভয়ে ঈদের নামাজ পড়তে যেতে পারেনি। পুলিশের বন্দোবস্ত করা গেলে তবেই তারা নামাজ পড়তে সক্ষম হয়।

তবুও উত্তেজনার প্রশমন হয় না। বাথানিটোলা আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায় এবং মে মাসের শুরু থেকে ১১ জুলাই-এর মধ্যে সেনার গুণ্ডারা সাত বার এই টোলায় আক্রমণ চালায়। প্রতিবারই পুলিশ ছিল নিষ্ক্রিয় কিন্তু গ্রামবাসীরা নিজেদের শক্তিতেই গুণ্ডাদের তাড়া করে। ১১ জুলাই সেনার গুণ্ডারা সফল হয় এবং মহম্মদ নঈমুদ্দিনের পরিবারের ৫ জন সদস্যকে তারা হত্যা করে ও পরবর্তীতে হাসপাতালে একটি শিশুর মৃত্যু হয়। মহম্মদ নঈমুদ্দিন ও তার স্ত্রী ঘটনার সময় গ্রামে না থাকায় রক্ষা পায়। কেউ কেউ বলেন এই নিদারুণ হত্যাকাণ্ডের পিছনে ছিল মজুরি ও জমি সংক্রান্ত বিরোধ। কিন্তু সত্য যা তা হল এই দ্বন্দ্ব এক বছর আগেই মিটে গিয়েছিল এবং সেখানে আর কোন অর্থনৈতিক অবরোধও ছিল না। শংকর শরণ তথ্যানুসন্ধানী টিমের রিপোর্টেও এই তথ্য প্রমাণিত হয়েছে এবং সত্য যা তা হল লড়াই-এর শুরু তার পরেই। সুতরাং এই বিরোধের ফলেই যে গণহত্যা—এই প্রচারের কোন সত্যতা নেই। দ্বিতীয়ত, যেভাবে এই গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে তা সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা, ঘৃণা ও প্রতিহিংসার মনোভাবকেই দেখিয়ে দেয় এবং তথ্যের ও যুক্তির বিচারে সমস্ত মানদণ্ডেই এই গণহত্যার সাম্প্রদায়িক চরিত্র ও তার পশ্চাদপট পরিস্ফুট হয়।

শান্তির জন্য আমাদের প্রচেষ্টা এবং রণবীর সেনা ও প্রশাসনের মনোভাব

আমরা সব সময়ই শান্তি প্রতিষ্ঠার সপক্ষে থেকেছি। এই কারণেই যে শান্তিকামী জনগণের আকাঙ্খার কথা মনে রেখে আমরা শান্তির জন্য উদ্যোগ নিতে শুরু করি। বিহটার (পাটনা) কিষাণ মহাসভার দ্বারা সংগঠিত স্বামী সরস্বতীর বার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আমরা শান্তির জন্য আলাপ আলোচনা শুরু করি। ভূমিহার জাতের আরও কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি সহ শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিন্হা এবং শ্রী ললিতেশ্বর শাহি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আমাদের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক কমরেড পবন শর্মা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা যথেষ্ট ইতিবাচক হয়েছিল। এই সব আলোচনার ঠিক দুদিন পর পার্টির সাধারণ সম্পাদক আরায় সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে শান্তির জন্য এক আবেদন প্রকাশ করেন। এই

আটের পাতায় দেখুন

আক্রান্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং শিণ্ডের চিঠি

মাসখানেক আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার শিণ্ডে রাজ্যে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে একটা চিঠি লেখেন। চিঠির মূল বিষয় ছিল, সন্ত্রাসবাদকে মোকাবিলা করার অভিযানে যেন নির্বিচারে নির্দোষ সংখ্যালঘু লোকেদের ক্ষতি না করা হয়। ঐ চিঠিতে বক্তব্য ছিল—'সন্ত্রাসবাদকে মোকাবিলায় কোনও আপস নয়। তবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা, আটকে রাখা চলবে না। পুলিশ যদি তা করে থাকে তবে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি দিতে হবে, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং তিনি যাতে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসতে পারেন তারও ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া যে পুলিশ অফিসার কোনও নির্দোষ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছেন তাঁকে দ্রুত ও কড়া শাস্তি দিতে হবে'।

চিঠির বক্তব্য থেকে প্রথমত আরও একবার প্রমাণ পাওয়া গেল যে, সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী অভিযানের নামে আসলে যা চলছে তা হল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনসাধারণের উপর, বিশেষ করে যুবকদের প্রতি অকথ্য রাষ্ট্রীয় নির্যাতন। এই তথ্যের সত্যতা মন্ত্রীর চিঠিতে একরকম স্বীকারই করে নেওয়া হল। তবে পরোক্ষে তা স্বীকার করে নিলেও কংগ্রেস ও কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের—কারও নিজেকে সাধু দাবি করার উপায় নেই। কারণ, একদিকে রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি ও সংঘ পরিবারের দিক থেকে যূথবদ্ধভাবে হিন্দুত্বের সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী হামলা তো রয়েছেই, যার প্রতি কংগ্রেস ও কেন্দ্রের মনমোহন সরকারের অনুসৃত অবস্থান মূলত নরম হিন্দুত্বের, পাল্লা দিতে কখনও কোথাওবা কট্টর হিন্দুত্ববাদী-পক্ষপাতদুষ্টও হয়ে থাকে, তার পাশাপাশি নামিয়েছে 'জাতীয় নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত করার' নামে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী রাষ্ট্রীয় অভিযান—যে অভিযানের উদ্দেশ্য হল পাইকারিহারে সংখ্যালঘু লোকেদের গ্রেপ্তার করা, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো, ভূয়া সংঘর্ষে হত্যা করা, লাশ গুম করে দেওয়া, কারাবন্দী করে রাখা। সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী অভিযানের ধারণাটি জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত দাবি করে আমদানি করেছে কংগ্রেস ও মনমোহন সরকার। এই তত্ত্ব ও এজেণ্ডা তাদের। এটা লাগু করা হয়েছে একইসাথে আমেরিকার 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদবিরোধী' সাম্রাজ্যবাদী-বিশ্ব রণনীতিতে দোসর হিসেবে ভারতকে জুড়ে দিতে, আর দেশের ভেতরে ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে ওঠা বিজেপি-সংঘ পরিবারের শক্তি জোটের পুনরুত্থানের চাপ সামলাতে। সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী এজেণ্ডাটা বিজেপির-ও।

সন্ত্রাসবাদবিরোধী পুলিশী অভিযান সংখ্যালঘু জনতার মধ্যে ব্যাপক বিরূপতার জন্ম দিচ্ছে। এই গনগনে আঁচ বুঝে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অগত্যা অভিযানের নিশানা থেকে নির্দোষ সংখ্যালঘুদের বাইরে রাখার, নির্দোষ ধৃতদের মুক্তি ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার, মূল স্রোতে ফিরে আসার সুযোগ করে দেওয়ার এবং দোষী পুলিশদের শাস্তি দেওয়ার কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রের কোনও উদ্বেগ নেই। শিণ্ডে উল্লেখও করেছেন, লাগাতার বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের দিক থেকে প্রতিবিধানের জন্য হস্তক্ষেপ দাবি করে চিঠি গেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে। সেই কারণেই শিণ্ডেজীর এই চিঠি-পদক্ষেপ। চিঠি আদৌ সদিচ্ছার ফলপ্রসূ নয়, দ্বিচারিতাই প্রমাণ করে। সংখ্যালঘুদের জীবন অতীষ্ঠ করা অত্যাচার বন্ধ করা ও তাদের ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য ইউ পি এ সরকার কিছুই করেনি। যেমন দিল্লীর বাট্‌লা হাউসে ভূয়ো সংঘর্ষ ঘটানোর জন্য দায়ি দিল্লী পুলিশের বিশেষ সেল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দ্বারা পরিচালিত। অথচ ঐ ভূয়ো সংঘর্ষের ঘটনার প্রকৃত নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি বারবার নানা অজুহাতে বানচাল করে দেওয়ার অপচেষ্টা চালিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলোতে (যেমন মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশেও) সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযানের নামে সংখ্যালঘু বিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয় যথেচ্ছ। আর ঐসমস্ত ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ, তদন্ত, বিচারের প্রশ্নে শিন্ডে ও তাঁর মন্ত্রক জেগে ঘুমোয়। সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী বিজেপি শাসিত রাজ্য থেকে শুরু করে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দাবি করা রঙ-বেরঙের আঞ্চলিক দল শাসিত রাজ্যগুলোতে (বিশেষত উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে) 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের বিভীষিকা' প্রচার করে সংখ্যালঘু বিরোধী পুলিশী ও বিচারবিভাগীয় অপরাধ চলে অবাধে। কেন্দ্রের প্রশ্রয়ে, ইন্ধনে। এত কান্ডের মাঝে শিন্ডে 'নিয়ন্ত্রণের চিঠি-রাজনীতি' কসরত শুরু করেছেন। কিন্তু ঠ্যালায় পড়ে যাইই তিনি বাণী শোনান বিচারের বিষয়গুলো তাঁর দিকনির্দেশে আদৌ সমাধান হওয়ার নয়। প্রথমত, 'দোষী-নির্দোষী' বাছবিচার হবে কীসের ভিত্তিতে, করবেই বা কে!! নির্ভর করা হচ্ছে সেই সরকার-পুলিশ-প্রশাসনের উপর যারাই অভিযানটা চালাচ্ছে। একই কারণে রেহাই বা মুক্তি পাওয়া, ক্ষতিপূরণ বা সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসতে পারা—কোনো কিছুরই নিশ্চয়তা মেলার নয়। দোষী পুলিশ অফিসারদের শাস্তি দেওয়ার বিচার-বিবেচনার প্রতশ্রুতিটা আরও হাস্যকর। যদি 'সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী অভিযান' পলিসিগতভাবে সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় তাহলে হয়তো দোষী পুলিশ অফিসারদের বিচারের একটা আবহ তৈরী হতে পারে। তা না করে অপরাধী পুলিশ অফিসারদের শাস্তির প্রসঙ্গ নিছকই তোলার জন্য তোলা।

তাছাড়া, পুলিশী নিগ্রহের শিকার হলে ক্ষতিপূরণ বা দোষী পুলিশ অফিসারদের শাস্তি দেওয়ার নজীর ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, থাকলেও রয়েছে একেবারে বিরলতম ব্যতিক্রম হিসেবে। কখনও কখনও পরিস্থিতির বিরাট চাপের মুখে শাসকের মসনদ থেকে হয়ত 'প্রতিশ্রুতি' দেওয়া হয়, কিন্তু যখনই তা কার্যকরি করার সময় ঘনিয়ে আসে তখন 'পুলিশের মনোবল ভেঙ্গে যাবে' অজুহাত দেখিয়ে শাসকেরা নিজেদের প্রতিশ্রুতি নিজেরাই গিলে ফেলে। এই পশ্চিমবঙ্গেও তার বহু তথ্যপ্রমাণ আছে, সে পূর্বতন বাম আমলে হোক বা বর্তমান তৃণমূল রাজত্বে হোক। এটাই প্রতিটি রাজ্যের শাসকের আচরণ, কেন্দ্রেরও তাই। দাবিটা বিবেচনা করা উচিত স্রেফ 'দোষী-নির্দোষ' বাছাই করে অভিযান চালানোর স্তোকবাক্য শোনাতে নয়, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান-এর গোটা বিষয়টাই ধারণাগত, পলিসিগত ও ব্যবহারিকভাবে প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত। তবেই এই অভিযানে সংখ্যালঘু জনতার যা সর্বনাশ হয়েছে তার সমস্ত ক্ষতিপূরণ, তাদের স্বভূমিতে ফেরানো ও পুনর্বাসন দেওয়া থেকে শুরু করে বাদবাকী যা যা করণীয় সেসব প্রকৃত রূপায়িত ও ত্বরান্বিত হতে পারে। কিন্তু শিণ্ডের চিঠির সর্বোপরি বক্তব্য হল, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান বন্ধের দাবির সাথে কেন্দ্র কোন আপসে আসতে রাজী নয়।

ভারতে সংখ্যালঘুরাই হচ্ছে 'সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর'— প্রচারটা হিন্দুত্বের সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক শক্তিগুলোর তৈরী। এই অসত্য প্রচারের দৌলতে সংঘ পরিবার পরিচালিত শক্তিগুলো অনেকক্ষেত্রে নিজেদের করা দাঙ্গাহাঙ্গামা, বিস্ফোরণ ঘটানো, হত্যাকাণ্ড চালানোর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের দায় সংখ্যালঘুদের উপর চাপিয়ে দেয়। তার তথ্যপ্রমাণ মিলেছে বারবার, যেমন ২০০৭ সালে হায়দ্রাবাদে মক্কা মসজিদ প্রাঙ্গনে বোমা বিস্ফোরণ থেকে অধুনা ('১৩) মুজফফরনগরের সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক আক্রমণের ঘটনায়। আর সন্ত্রাসবাদ বিরোধী রাষ্ট্রীয় অভিযান সংঘ শক্তিগুলোর তৈরী গোয়েবেলসীয় প্রচারকেই অনুসরণ করছে। তথাকথিত এই অভিযান চালাতে কেন্দ্রের মনমোহন সরকার তৈরী করেছে এন সি টি সি (ন্যাশনাল কাউন্টার টেররিজম সেন্টার), খোদ মার্কিনের বানানো মডেলের আদলে, তার হাতে রয়েছে ইউ এ পি এ-র মতন কালাকানুন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন 'কিছু সংযম' সহযোগে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান আপসহীনভাবে চালানো জারী রাখতে রাজ্যগুলোর কাছে চিঠি লিখছেন তখন মুজফফরনগরে বিজেপির দ্বারা সংখ্যালঘু নিধন অভিযান চলেছে অবাধে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে মোদীকে সামনে রেখে পদ্ম প্রতীকের শক্তি পুনরুত্থানের জন্য পুরোদমে ময়দানে। সমাজ ও রাজনীতিতে কর্পোরেট সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী মেরুকরণের জন্য তারা নিয়েছে দ্বৈত কৌশল। প্রথমে সংখ্যালঘুদের আক্রমণ করে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলা, প্রবল নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ফেলা, আর তার উপর ভিত্তি করে এই আশ্বাস দেওয়া যে নিস্তার মিলতে পারে একটাই শর্তে—মোদী জমানায় সংখ্যালঘু গণহত্যার কবরের উপর কর্পোরেটমুখী উন্নয়নের যে মডেল নির্মিত হচ্ছে, তাকে মেনে নিয়ে কেন্দ্রের শাসনক্ষমতায় বিজেপি জোটের শক্তিকে নিয়ে আসার ঐকমত্যে আসতে হবে। সংখ্যালঘু জনতার ওপর সংগঠিত বর্বরতার বিচারের প্রশ্নে চুপ থাকতে হবে, সংখ্যালঘুর অস্তিত্বের অধিকারের প্রশ্নে সংঘপন্থীদের খবরদারি মেনে চলতে হবে; নচেৎ কোন রেহাই নেই। এই বার্তা সারা দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে দিতে কিছু ঘটনা ঘটিয়ে চলার মত্তভূমি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে যেমন উত্তরপ্রদেশের আজমগড় থেকে মুজফফরনগর, বিহারেও দ্বারভাঙ্গা, মধুবনী, সমস্তিপুর জেলাগুলোকে। এখন ভারতের রাষ্ট্রশক্তির কাছে (সংখ্যালঘু) সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান এক মস্তবড় কর্মসূচী, যার মূল তত্ত্বাবধায়ক 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র স্বঘোষিত ঠিকেদার কেন্দ্রের কংগ্রেস জোটের ইউ পি এ সরকার। উত্তরপ্রদেশে সেটা চালাচ্ছে 'মুসলিম-যাদব' সামাজিক সমীকরণের দৌলতে ক্ষমতায় আসা ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র তথাকথিত মসিহাঁ দাবি করা 'সমাজবাদী' অখিলেশ যাদব সরকার। বিহারে সেটা চলছে ছদ্মধর্মনিরপেক্ষ নীতীশকুমারের রাজত্বে। প্রতিশ্রুতি ও পরিণতির কি নিষ্ঠুর পরিহাস।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন বিজেপির তোলা 'মুসলিম তোষণের' অভিযোগ ইউ পি এ এবং কংগ্রেসের গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী অভিযানকে অব্যাহত রাখতে চিঠিতে ফের জোর দিলেন তখন মোদীর গুজরাটের দ্বিতীয় সর্দার অমিত শাহ্ ইতিমধ্যেই উত্তরপ্রদেশে ভারপ্রাপ্ত। এক দশক আগে দেশ ও দুনিয়া বাইরে থেকে প্রত্যক্ষ করেছিল গুজরাট গণহত্যাকাণ্ড। এখন নানা আভ্যন্তরীণ কারণে ফেঁসে গিয়ে অপরাধী অভিযুক্ত ও কারারুদ্ধ থাকা গুজরাটের দুঁদে খুনী প্রাক্তন আই পি এস বানজারার চিঠি প্রকাশের সূত্রে দেশ ও দুনিয়া জানতে পারছে মোদী মেশিনারীর তৈরী সংখ্যালঘু নিকেশ অভিযানের সমস্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের তথ্যকথা।

এত কিছু প্রকাশ হচ্ছে, এত কিছু ঘটছে, তা সত্ত্বেও হিন্দুত্বের ভোটব্যাঙ্কে বিজেপির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এঁটে উঠতে কংগ্রেস জোট সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী রাষ্ট্রীয় অভিযান সমান জোরের সাথেই জারী রাখতে চাইছে। তার মধ্যে শিণ্ডের চিঠিতে সংখ্যালঘুদের প্রতি সহমর্মীতা দেখানোর যে হাবভাব, তার পেছনে আসল কারণ হল লোকসভা ভোট সামনে এবং নিরাপত্তাহীনতাবোধ করা সংখ্যালঘু ভোট পাওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা যাচ্ছে না কংগ্রেসের। কিছু সদাশয়তা দেখিয়ে যদি দূরত্ব দূর করা যায়। শিণ্ডের চিঠিতে সেই ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা চালানোর ছাপ।

- অনিমেষ চক্রবর্তী

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বজবজ ও বিষ্ণুপুর ব্লকে মহিলা সমিতির কর্মী সম্মেলন

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বজবজ ও বিষ্ণুপুর ব্লকে যথাক্রমে গত ২১ ও ২৫ নভেম্বর সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির কর্মী সম্মেলন হয়। সম্মেলন দুটিতে উপস্থিত ছিলেন মহিলা সমিতির জেলা সম্পাদিকা কাজল দত্ত। তিনি নারীদের উপর যৌন হিংসা সহ অন্যান্য শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে জোরদার করার কথা বলেন। এছাড়া কর্মী সম্মেলনগুলোতে স্থানীয় কর্মী-সংগঠকরাও এগিয়ে এসে বক্তব্য রাখেন। দুটি ব্লকেই ১৩ সদস্যের কমিটি নির্বাচিত হয়। বজবজ ব্লকে সম্পাদিকা ও সভানেত্রী নির্বাচিত হন যথাক্রমে অঞ্জনা মাল ও মীনা করণ, বিষ্ণুপুর ব্লকে সম্পাদিকা ও সভানেত্রী হয়েছেন পূর্ণিমা হালদার ও টুসি চক্রবর্তী। এছাড়া, সম্মেলনে ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠন এ আই সি সি টি ইউ-র জেলা সহ সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ দত্ত, আর ওয়াই এ-র বজবজ ব্লক সম্পাদক আশুতোষ মালিক, পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সমিতির দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক দিলীপ পাল বক্তব্য রাখেন। ইন্দ্রজিৎ দত্ত শ্রমজীবী মহিলাদের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মহিলা সমিতি ও এ আই সি সি টি ইউ-র মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার কথা বলেন। আর ওয়াই এ সম্পাদক মহিলা সংগঠন গড়ে তোলার কাজে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। দিলীপ পাল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নারী ধর্ষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। উৎসাহ-উদ্দীপনাপূর্ণ আলোচনা ও মতামত পেশ করার মধ্য দিয়ে এবং শক্তিশালী নারী আন্দোলন ও মহিলা সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে সম্মেলন দুটি সমাপ্ত হয়।

... উত্তরপ্রদেশ বাঁচাও

তিনের পাতার পর

মহম্মদ সেলিম। বক্তা ছিলেন সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সভানেত্রী তাহিরা হাসান, সি পি আই-এর উত্তরপ্রদেশ যুগ্ম সম্পাদক অরবিন্দ্ রাজ স্বরূপ, ''রিহাই'' মঞ্চের আহ্বায়ক।

সমাবেশের এক উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য হল, লক্ষ্ণৌ রেলওয়ে স্টেশন থেকে জ্যোতিবা ফুলে পার্ক পর্যন্ত ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ মিছিল হয়। কৃষক, শ্রমিক, যুবক ও ব্যাপক সংখ্যায় মহিলাদের ফ্ল্যাগ-পোস্টার সহ বর্ণাঢ্য মিছিলে বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও সংখ্যালঘু ডাইনী খোঁজের বিরুদ্ধে দিল্লীতে সভা

২৫ সেপ্টেম্বর দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং সংখ্যালঘু ডাইনী খোঁজের বিরুদ্ধে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় বক্তব্য রাখেন সি পি আই (এম এল) সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, ডাইনী খোঁজের ভুক্তভোগীদের আত্মীয়-স্বজন, বর্ষীয়ান সাংবাদিক সৈয়দ মুহম্মদ কাজমি, নাগরিক অধিকার রক্ষা সমিতির (এ পি সি আর) আখলাক, সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য মহঃ সেলিম এবং জে এন ইউ ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা।

কমরেড দীপঙ্কর বলেন, এমন একটা সময় যাচ্ছে যখন সন্ত্রাস রোখার নামে মুসলমানদের মিথ্যা অভিযুক্ত করা হচ্ছে, মাওবাদ বিরোধিতার নামে গণআন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে ডাইনী খোঁজ চালানো হচ্ছে—এর বিরুদ্ধে আমাদের সমবেতভাবে আমেরিকার ধাঁচে নয়া-উদারনৈতিক পরিকল্পনা, সাম্প্রদায়িক ডাইনী খোঁজ এবং পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক হিংসা এবং কর্পোরেটমুখী কর্মসূচী যার প্রতি ইউ পি এ এবং এন ডি এ উভয়েই গভীরভাবে দায়বদ্ধ—সংগ্রাম করা দরকার। তিনি বলেন, বিহারে বিজেপি নরেন্দ্র মোদীর 'হুঙ্কার' র‍্যালী নিয়ে সাড়ম্বরে প্রচার করছে—সি পি আই (এম এল) এবং রাজ্যের দরিদ্র ও বঞ্চিত সম্প্রদায় সংগঠিত করছেন ''খবরদার'' র‍্যালী গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য।

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য মহঃ সেলিম বললেন, মার্কিনীদের দ্বারা পরিকল্পিত ইসলাম আতঙ্ক প্রচারিত হয়েছে বিশ্বজুড়ে তারই ধারায় ভারতের রাজ্যে রাজ্যে চলছে মিথ্যা অভিযোগে ধরপাকড়, হাজতে অত্যাচার এবং হত্যা, ভুয়ো সংঘর্ষ। খুবই কম কয়েকটি মামলায় আদালতে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে মিথ্যা মামলায় অভিযুক্তদের প্রতি। কিন্তু পুলিশী তরফে বা সন্ত্রাস বিরোধী স্কোয়াডের তরফে কোন ভুলের স্বীকারোক্তি বা ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়নি। কোন ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি এই সমস্ত জেল ফেরত অত্যাচারিত মিথ্যা মামলায় অভিযুক্তদের। আমেরিকার পরিকল্পিত এই ইসলাম আতঙ্কর পদাঙ্ক অনুসরণ করছে কংগ্রেস, এস পি এবং ইউ পি এ অত্যন্ত বাধিতভাবে, যা কিনা এই ধরনের ঘটনাকে ভীতিজনকভাবে বাড়িয়ে তুলেছে।

ভারতে সাম্প্রদায়িকতার মূল উৎস, বিভাজন এবং শাসনের নীতি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তাদের প্রাথমিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখার ব্যাপারে আলোকপাত করলেন নাগরিক অধিকার রক্ষা সমিতির (এ পি সি আর) আখলাক। আমাদের সংগ্রাম কেবলমাত্র মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত অত্যাচারিত ও কারাবন্দী মুসলিমদের মুক্ত করাই নয়। আমরা চাই বোমা বিস্ফোরণের এবং সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের এবং যারা সামরিক স্কুলে সন্ত্রাসবাদী হানায় শিক্ষণপ্রাপ্ত তাদের সঠিক বিচার—বললেন আখলাক। দারভাঙ্গার নিয়াজ আহমেদ বললেন, কিভাবে সমস্তিপুর ও দারভাঙ্গার নিরীহদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দল যেমন জে ডি (ইউ) এবং কংগ্রেস নির্বাক ছিল এবং এই ডাইনী খোঁজ এবং সাম্প্রদায়িকতার মিথ্যা অভিযুক্তদের সুবিচারের কোন নিশ্চয়তা দেয়নি। প্রতাপগড়ের কুণ্ডা গ্রামের অনোয়ার এবং রামপুরের শের আলি বললেন তাঁদের আত্মীয়রা কিভাবে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন তার অভিজ্ঞতা। জে এন ইউ এস ইউ-র যুগ্ম সম্পাদক সরফরাজ হামিদ এবং সহ-সভাপতি অনুভূতি, যাঁরা মালেগাঁও এবং মুজফফরনগরের তদন্তকারী দলের সদস্য ছিলেন, সভার উদ্দেশ্যে বললেন, মালেগাঁও-এর মুসলমানদের কিভাবে বছরের পর বছর জেলে কাটাতে হচ্ছে এবং মুজফফরনগরের দাঙ্গাকে মানব বিদ্বেষীরা কিভাবে সমবেতভাবে পরিচালিত করেছে ও মুসলমানদের 'জেহাদী' এবং হিন্দু মহিলাদের প্রতি কামুক আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন বলে চিত্রিত করেছে।

সাংবাদিক অজয় আশীর্বাদ, যিনি মুজফফরনগর সাম্প্রদায়িক হিংসার বহু সংবাদের তথ্য দিয়েছেন তিনি উল্লেখ করেন কিভাবে এই পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক হিংসাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে পিতৃতান্ত্রিকতা। তিনি বলেন ''কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোরে, গুজরাটে আর এখন মুজফফরনগরে আমরা দেখেছি কিভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দু মহিলাদের 'ভালোবাসার জিহাদের' ফাঁদে ফেলার মিথ্যা গল্প প্রচার করাটা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক কর্মসূচীর একটি অঙ্গ।'' তিনি আরও বলেন, সাম্প্রদায়িক হিংসার পরিণামে সেই সমস্ত গ্রামগুলোতে জনসংখ্যার সম্প্রদায়গত পরিবর্তন হচ্ছে যেখানে মুসলমানদের বাড়ি, মসজিদ ধ্বংস করে হিংসার আগুন ছড়ানো হচ্ছে।

প্রখ্যাত সাংবাদিক সৈয়দ মুহম্মদ কাজমি যিনি নিজে সন্ত্রাসবাদী মিথ্যা অভিযোগের মামলায় অভিযুক্ত হয়ে দীর্ঘদিন ধরে আইনি লড়াই লড়ছেন তিনি বললেন, দেশ ভাগ হওয়ার পর সাম্প্রদায়িক হিংসা ঘটেছে, ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা হয়েছে, এখন সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলো আন্তরিকভাবে মুসলিমদের মৃতদেহের ওপর হেঁটে ক্ষমতার মসনদে আসীন হতে চাইছেন।'' সভার শেষে সংখ্যালঘু ডাইনী খোঁজ, পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক হিংসা এবং সাম্প্রদায়িক হিংসার ভুক্তভোগীদের যথাযোগ্য সুবিচারের দাবিসহ কয়েকটি প্রস্তাবনা গ্রহণ করা হয়।

বিপ্লবী যুব অ্যাসোসিয়েশন (আর ওয়াই এ)-এর আসলাম খান উল্লেখ করেন বিজেপি এবং সঙ্ঘ পরিবারের নেতৃত্বে পরিচালিত ও পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক হিংসার এই পরিঘটনাকে বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলো ক্ষমা প্রদর্শন করছেন দুর্ভাগ্যজনকভাবে।

সভা থেকে প্রস্তাবনা গ্রহণ করা হয় ঃ

● সাম্প্রদায়িক এবং লক্ষ্যনির্দিষ্ট হিংসা বিরোধী বিচার এবং ক্ষতিপূরণ সহায়ক বিল ২০১১-কে লাগু করতে হবে। মুসলিম ডাইনি খোঁজ বিরোধী নীতি গ্রহণকারী দোষী পুলিশ এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কড়া শাস্তি প্রদান, মিথ্যা অভিযুক্তদের ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণ, সময়মত বিচার, বিশেষ আদালত তৈরী করা যেখানে একাধিক মামলায় অভিযুক্তদের বিচার হবে এবং সময়মত জামিন দেওয়া যাবে।

● উত্তরপ্রদেশের নিমেশ কমিশনের রিপোর্টকে রূপায়ণ করতে হবে। হাজতাধীন বন্দী খালিদ মোহাম্মদ এবং মহারাষ্ট্রের ইয়েরওয়াদা জেলবন্দী কাতীল সিদ্দিকির মৃত্যুর জন্য দায়ী অফিসার-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ; একটি জাতীয় ট্রাইব্যুনাল গঠন যেখানে সংখ্যালঘুদের ডাইনী খোঁজ এবং উৎপীড়নের মামলাগুলোর বিচার হবে; মুজফফরনগর দাঙ্গার স্বাধীনভাবে তদন্ত করা এবং দোষীদের কড়া শাস্তি প্রদান করতে হবে এবং ভুক্তভোগীদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন দিতে হবে; এম পি এবং এম এল এ-রা যারা সাম্প্রদায়িক এবং জাতপাতের হিংসায় দোষী অভিযুক্ত হবে তাদের নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়া বাতিল করতে হবে; কাশ্মীরে গ্রেপ্তার হওয়া সমস্ত ব্যক্তিকে সত্বর মুক্তি দিতে হবে কোন চার্জশীট বা বিচার ছাড়াই যাদের শুধুমাত্র জম্মু এবং কাশ্মীর জননিরাপত্তা আইনের (যেখানে কোন ব্যক্তিকে প্রমাণ ব্যাতীত কেবলমাত্র সন্দেহের বশে কারাগারে বন্দী করা যায়) অধীনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

● সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে যেমন জম্মু কাশ্মীরে জন নিরাপত্তা আইন, সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন (এ এফ এস পি এ)-এর মত সমস্ত কালা-কানুন বাতিল করতে হবে।

... সরকারি প্রচার বনাম রূঢ় সত্য

ছয়ের পাতার পর

আবেদন সংবাদপত্রগুলোতে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়। সমস্ত শান্তিপ্রিয় মানুষ একে স্বাগত জানান। আমরা রণবীর সেনার কাছ থেকেও সদুত্তর প্রত্যাশা করেছিলাম। পরবর্তীতে, দুপক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করছিলেন এমন এক বন্ধুর মারফত আমরা এক বার্তা পাঠাই যে রণবীর সেনাও কোন বিবৃতি প্রকাশ করুক যাতে আমরা পরবর্তী ধাপে পৌঁছাতে পারি। আমাদের বন্ধু বার্তা বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু উত্তর মিলেছে হতাশাজনক। আমাদের শান্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এলাকায় যাতে আমরা উন্নয়নমূলক কাজে হাত দিতে পারি তার জন্য শান্তি খুবই জরুরী ছিল, তাই আমরা শান্তি প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করিনি। এবার আমরা ভিন্ন এক পদ্ধতিতে শুরু করি। আমরা ভেবেছিলাম জনমত সংগঠিত করেই জনগণের দিক থেকে চাপ সৃষ্টি করা দরকার। আমরা আশা করেছিলাম, প্রশাসনও আমাদের সাহায্য করবে। '৯৬-এর জুনে, প্রধান প্রধান বাজার ও গ্রামের চকগুলোতে ডজন খানেক জনসভা সংগঠিত করার মাধ্যমে আমরা শান্তি অভিযান শুরু করি এবং মানুষকে এই শান্তি প্রচেষ্টায় এগিয়ে আসতে আহ্বান জানাই। ইতিমধ্যেই, রণবীর সেনার কিষাণদের ও আমাদের জনগণের মধ্যে পাঁচটি গ্রামে দ্বন্দ্বের নিরসন করা হয়। এই প্রচারাভিযানের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের প্রশ্নে আমাদের উদ্যোগ ভাল সাড়া ফেলে এবং তরারি ব্লকে আমরা 'ঘেরা ডালো ডেরা ডালো' আন্দোলন শুরু করি। আন্দোলন চমৎকার সাফল্য লাভ করে।

আরায় শান্তির প্রশ্নে আমরা এক সেমিনারের আয়োজন করি যেখানে সাধারণ জনগণের সঙ্গে অনেক শ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবী ও শান্তিপ্রিয় মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

এটা দুর্ভাগ্যজনক যে রণবীর সেনা শান্তিকামী জনগণের আশা আকাঙ্খাকে কোন মর্যাদাই দেয়নি এবং শান্তির জন্য প্রচার অভিযানের সমগ্র পর্যায় জুড়েই তারা ধারাবাহিকভাবে হিংসাত্মক প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করেছে। এভাবে আমাদের দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও সফল হয়নি। একটি লিফলেটের মাধ্যমে রণবীর সেনা এই শান্তি প্রচেষ্টাকে অগ্রাহ্য করার জন্য জনগণের কাছে আহ্বান জানায় এবং চলমান যুদ্ধে সামিল হওয়ার ডাক দেয়। এটাই হয়ত সেই কারণ যে জন্য 'বাথানিটোলা' ঘটিয়ে শান্তি প্রচেষ্টাকে পুরস্কৃত করা হল।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কেন্দ্র বিহার কিভাবে গণতন্ত্রের সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে বাথানিটোলা গণহত্যা ও সরকারি জবাব তারই জীবন্ত উদাহরণ। এই খেলায় সমস্ত পশ্চাদগামী ও অন্ধকারের শক্তিগুলো জোটবদ্ধ হয়েছে—যে জোট হল মাফিয়া ও সামন্ততান্ত্রিক কায়েমী স্বার্থের জোট।

আমরা সমস্ত প্রগতিশীল, বিপ্লবী, গণতান্ত্রিক, সমাজবাদী ও বামপন্থী সংগঠন ও জনগণের কাছে গণতন্ত্রের জন্য এই সংগ্রামে সামিল হওয়ার ও এই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

আমরা বাথানিটোলা গণহত্যার জন্য দায়ী প্রশাসনিক পদাধিকারীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছি। এই যুদ্ধে জয় ছিনিয়ে নিতে আমরা যদি ব্যর্থ হই তাহলে কাসোয়ানের মত অপরাধীদের বেড়ে ওঠা আমরা রোধ করতে পারব না, পারব না পুলিশ আর প্রাইভেট আর্মির দ্বারা আরো আরো বাথানিটোলার মত নরমেধ যজ্ঞ ঘটানোকে রুখে দিতে।

আমরা আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে বুদ্ধিজীবীদের সভা সমিতিতে প্রস্তাব গ্রহণ করে, মিছিল সংগঠিত করে, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তার বার্তা পাঠিয়ে অথবা জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের শাস্তির দাবি জানিয়ে বিবৃতি প্রকাশ করে ন্যায়বিচারের জন্য এই আন্দোলনে সামিল হোন।

দারভাঙ্গায় সভা

দারভাঙ্গার লাহেরিয়াসরাই-এর কমলা নেহেরু পাঠাগারে সংখ্যালঘু ডাইনী খোঁজ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে সি পি আই (এম এল) এবং বিপ্লবী মুসলিম কনফারেন্স আয়োজিত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সি পি আই (এম এল)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড দীপঙ্কর ভট্টাচার্য উল্লেখ করেন, ভূয়ো সংঘর্ষ এবং মিথ্যা মামলায় মুসলিমদের অভিযুক্ত করার বিরুদ্ধে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে জোরালো প্রতিবাদ করতে হবে। তিনি প্রশ্ন করেন নীতীশ কুমারের ধর্মনিরপেক্ষ সরকার দারভাঙ্গার মুসলিম যুবকদের সন্ত্রাসবাদী মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করার বিরুদ্ধে কিছু করছেন না কেন?

জে এন ইউ এস ইউ সভাপতি আকবর চৌধুরি বলেন, সাচার কমিটির রিপোর্ট এবং রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যে অবিচার এবং বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে তার প্রচুর প্রমাণ দিয়েছেন। লক্ষ্ণৌ আদালতের অ্যাডভোকেট এবং রিহাই মঞ্চের মোহম্মদ সোয়াইব বলেন, উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় এবং আজমগড়ে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে প্রচার চলছে যা কিনা ভারতীয় সংবিধান এবং এর আইনি প্রস্তাবনার বিরুদ্ধেই যায়।

সি পি আই (এম এল)-এর পলিটব্যুরো সদস্য এবং মিথিলাঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ধীরেন্দ্র ঝা সমস্ত বাম শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়ে বলেন নিরীহ মুসলিম যুবকদের জন্য সুবিচার ও বিহার এবং কেন্দ্রীয় সরকার এবং সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর মিলিতভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্রের পক্ষে সংগ্রামে সামিল হতে হবে।

মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত যুবকদের পরিবারের লোকেরা তাঁদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন সভায়। এছাড়াও বলেন পাটনা উচ্চ আদালতের আইনজীবী মোহঃ জাভেদ, আই এম সি নেতা মোহঃ আনোয়ার হোসেন, সিওয়ানের জাভেদ বেগ, সমস্তিপুরের খুরশিদ খৈর, সি পি আই (এম এল)-এর জেলা সম্পাদক বৈদ্যনাথ যাদব, জে এন ইউ-র মোহঃ তাবরেজ, আরারিয়ার মোহঃ নারুল্লা, সাংবাদিক আখলাক, মহুয়ার রিজওয়ান, জামালুদ্দিন, মোহঃ ইমতিয়াজ, আলি ইমাম ফারিদি এবং অন্যান্যরা। সভায় সভাপতিত্ব করেন নেয়াজ আহমেদ, সাদিক ভারতি এবং সফি আলম। সবশেষে সভাপতির ভাষণে নেয়াজ আহমেদ বলেন, এই ''মুক্ত করার প্রচার অভিযান'' (রিহাই অভিযান) উত্তরপ্রদেশের মত বিহারেও শুরু করা হবে। সভা থেকে দশ দফা প্রস্তাবনা গৃহীত হয়।

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ও ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ২ ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com